গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

জেলা তথ্য ঃ খুলনা

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন
এবং
আফসানা ইয়াসমীন

জানুয়ারি, ২০০৫

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস
সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প

জেলা তথ্য :
খুলনা

প্রকাশকাল :
জানুয়ারি, ২০০৫

প্রকাশনায় :
পিডিও-আইসিজেডএমপি
সায়মন সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি : ৪ এ, রোড : ২২
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২
ফোন : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪, ৯৮৯২৭৮৭
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল : pdo@iczmpbd.org
ওয়েব সাইট : www.iczmpbangladesh.org
ও
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
বাড়ি : ১০৩, রোড : ০১
বনানী, ঢাকা ১২১৩।

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস - সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ, যেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে মূল মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) মূল সংস্থা।

মুদ্রন সহযোগিতায় :

ISBN :

তথ্যের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি প্রয়াস

জেলা তথ্য : খুলনা

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। একদিকে প্রকৃতির অপার সম্পদ অন্যদিকে প্রকৃতির বিরূপতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ অঞ্চলের ১৯টি জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে পিডিও-আইসিজেডএমপি প্রকল্প একটি নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করছে। কর্মকৌশলগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার প্রতিটির জন্য একটি করে তথ্য বই লেখা হয়েছে যাতে করে জেলার জনগণ স্ব-স্ব জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন এবং আফসানা ইয়াসমীন যৌথভাবে এই বইটি লিখেছেন। অন্যান্য যারা এই বই লিখতে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মহিউদ্দিন আহমদ ও ড. মোঃ লিয়াকত আলী। অক্ষর বিন্যাস ও লে-আউটে সহযোগিতা করেছেন মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া ।

বইটির পর্যালোচনাসহ মতামত দিয়েছেন পিডিও ও ওয়ারপো-র বিশেষজ্ঞ বৃন্দ। এ ছাড়া খুলনা জেলার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ মতামত দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। ড. এম. রফিকুল ইসলাম বইটি লিখতে সার্বিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জেলাভিত্তিক। ঐতিহ্যগতভাবেই মানুষের জেলাভিত্তিক পরিচয় রয়েছে। অপরদিকে জেলাগুলোরও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রও জেলা। অন্যদিকে উপকূলীয় জীবনমানের উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত উপকূলীয় অঞ্চলের নীতিমালায় রয়েছে।

সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হল জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে জেলাভিত্তিক উদ্যোগকে কার্যকর করতে প্রয়োজন জেলার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই, জেলার জনগণকে তাদের নিজ নিজ জেলার অবস্থা, অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য জেলাভিত্তিক এই বই লেখা হয়েছে। উপকূলীয় ১৯টি জেলার জন্য আলাদা আলাদা বই লেখা ও প্রচার করা হচ্ছে।

এই বইটি লেখা হয়েছে খুলনা জেলার জনগণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করার জন্য। এতে রয়েছে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ণনা, ভৌত ও মানবসম্পদের বর্ণনা এবং ভবিষ্যতে এ সম্পদের অবস্থা কি হতে পারে সেই বর্ণনা।

এই বই-এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে 'সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা' এবং 'সম্ভাবনা ও সুযোগ'-এর উপর বিশদ বর্ণনা। এই বর্ণনার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে অন্যান্য অংশে। তাই জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জেনে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগ্রহ সৃষ্টি ও অবদান রাখতে এই বই জনগণ তথা উন্নয়ন অংশীদারদের সাহায্য করবে।

তা ছাড়াও 'উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ' আলোচনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক আলোচনায় এই বই সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করি।

এই বইয়ের জন্য তথ্য নেয়া হয়েছে প্রধানত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এর পরেই সবচেয়ে বেশি তথ্য এসেছে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এ ছাড়াও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিদপ্তর ও বাংলাপিডিয়া থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

সাহায্য নেয়া হয়েছে খুলনার উপর লিখিত বিভিন্ন বই থেকে -

১. মিত্র, সতীশচন্দ্র, ১৯১৪। যশোহর খুলনার ইতিহাস-প্রথম খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, ১৯১৪।

২. মিত্র, সতীশচন্দ্র, ১৯২২। যশোহর খুলনার ইতিহাস-দ্বিতীয় খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, ১৯২২ ।

৩. মিয়া, গ. শ., ২০০২। মহানগরী খুলনা : ইতিহাসের আলোকে। খুলনা, ডিসেম্বর, ২০০২।

৪. বি.বি.এস., ২০০৩। কৃষি শুমারী ১৯৯৬ : জেলা সিরিজ খুলনা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, এপ্রিল, ২০০৩।

৫. ওয়াজেদ, আবদুল, ২০০২। বাংলাদেশের নদীমালা। পালক পাবলিশার্স। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০২।

৬. PDO-ICZMP, 2001. Inventory of Coastal & Estuarine Island & Char lands (Draft Report). Program Development Office for Intergrated Coastal Zone Management Plan Project, Bangladesh. Dhaka, August 2001.

৭. CEGIS, 2004. Vulnerability Analysis of Major Livelihood Groups in the Coastal Zone of Bangladesh. Final Report. Centre for Environmental and Geographic Information Services. Dhaka, May 2004.

৮. Bari, L., K., G., M., 1979. Bangladesh District Gajetteers Jessore, Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka, February 1979.

তথ্য নেয়া হয়েছে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে খুলনা জেলার উপর প্রকাশিত সংবাদ ও নিবন্ধ থেকে।

এ ছাড়াও বইটির বিশেষ পর্যালোচনা ও মূল্যবান তথ্য ও মতামত দিয়েছেন :

- জনাব মোস্তফা নূরুজ্জামান, পরিচালক, সুশীলন, খুলনা।
- জনাব আশরাফ-উল-আলম টুটু, সমন্বয়কারী, সিডিপি, খুলনা।
- জনাবা সাঈদা বেগম, পরিচালক, উন্নয়ন, খুলনা।
- জনাব কাজী ওয়াহিদুজ্জামান, নির্বাহী প্রধান, নবলোক, খুলনা।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ
জেলা মানচিত্র

সূচনা **১-৫**
এক নজরে খুলনা ২
জেলার অবস্থান ৩
উপজেলা তথ্য সারণী ৪

প্রকৃতি ও পরিবেশ **৭-২০**
প্রাকৃতিক পরিবেশ ৭
খনিজ সম্পদ ১৩
কৃষি সম্পদ ১৪
দুর্যোগ ১৫
বিপদাপন্নতা ২০

জীবন ও জীবিকা **২১-২৬**
জনসংখ্যা ২১
জনস্বাস্থ্য ২২
শিক্ষা ২৩
অভিবাসন ২৪
সামাজিক উন্নয়ন ২৪
প্রধান জীবিকা দল ২৪
অর্থনৈতিক অবস্থা ২৬
দারিদ্র্য ২৬

নারীদের অবস্থান **২৭-২৮**

অবকাঠামো **২৯-৩৫**
রাস্তা-ঘাট ২৯
রেল পথ ২৯
নৌ-পথ ২৯
পোল্ডার ৩০
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ৩০
হাট-বাজার ও বন্দর ৩১
বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ ৩১
শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো ৩২
সেচ ও গুদাম সুবিধা ৩৩
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ৩৩
গবেষণা প্রতিষ্ঠান ৩৩
উন্নয়ন প্রকল্প ৩৪
হোটেল বা অবকাশযাপন কেন্দ্র ৩৪

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা **৩৭-৪১**
পরিবেশগত সমস্যা ৩৭
সম্ভাব্য প্রতিবেশগত সমস্যা ৩৯
আর্থ-সামাজিক সমস্যা ৩৯
পর্যটন বিষয়ক সমস্যা ৪১
যোগাযোগ ৪১

সম্ভাবনা ও সুযোগ **৪৩-৪৬**
প্রাকৃতিক সম্পদ ৪৩
কৃষি ও অর্থনীতি ৪৪
আর্থ-সামাজিক ৪৫
শিল্প ও বাণিজ্য ৪৫
পর্যটন শিল্প ৪৬
যোগাযোগ ৪৬

ভবিষ্যতের রূপরেখা **৪৭-৪৮**

দর্শনীয় স্থান **৪৯-৫০**

জেলা মানচিত্র

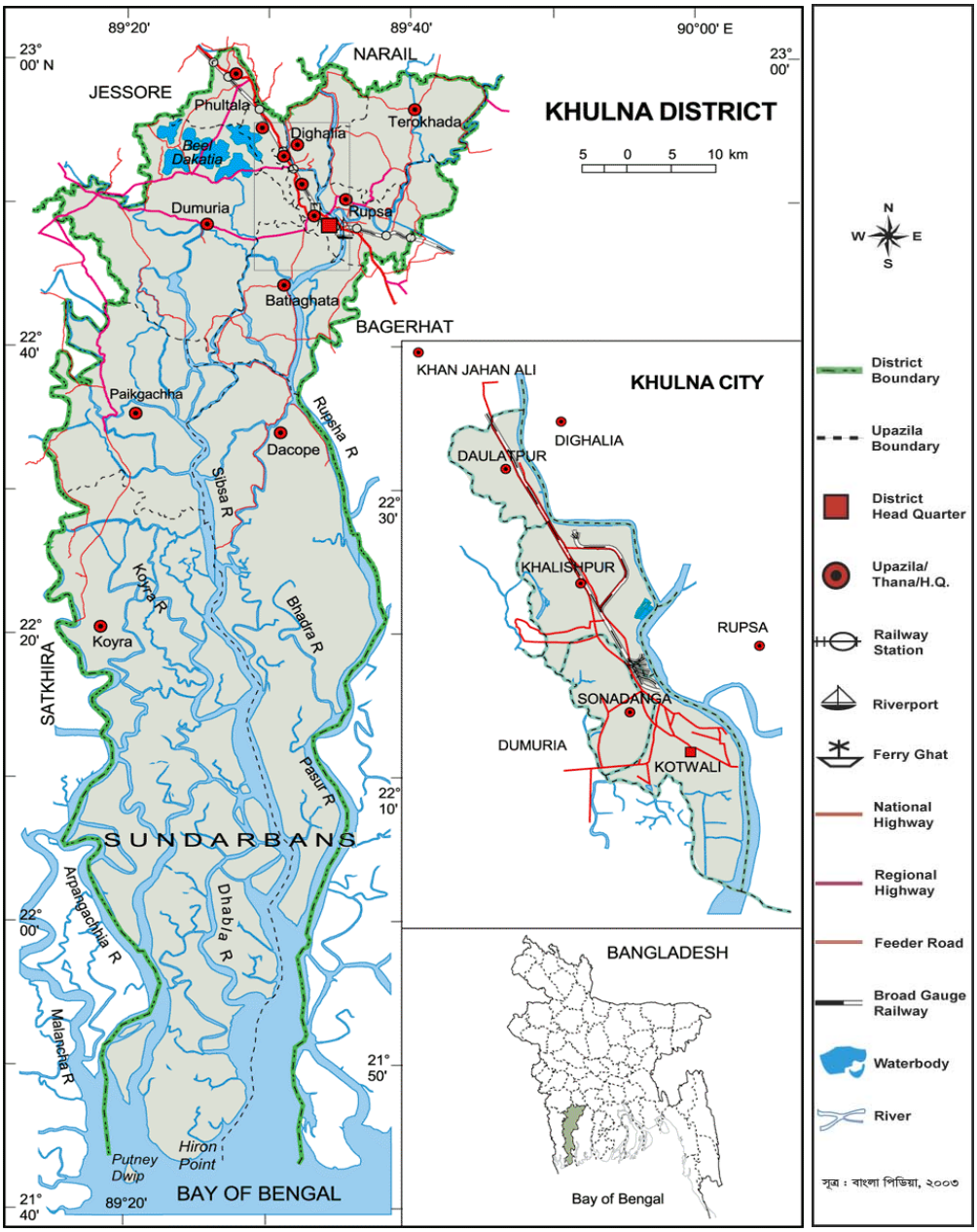
KHULNA DISTRICT
KHULNA CITY
89°20'
89°40'
90°00' E
23° 00' N
23° 00'
22° 40'
22° 30'
22° 20'
22° 10'
22° 00'
21° 50'
21° 40'
NARAIL
JESSORE
Phultala
Beel Dakatia
Dighalia
Terokhada
Dumuria
Rupsa
Batiaghata
BAGERHAT
Paikgachha
Dacope
Rupsha R
Sibsa R
Koyra R
Bhadra R
Pasur R
Koyra
SATKHIRA
SUNDARBANS
Arpangachhia R
Dhabla R
Malancha R
Putney Dwip
Hiron Point
BAY OF BENGAL
KHAN JAHAN ALI
DIGHALIA
DAULATPUR
KHALISHPUR
RUPSA
SONADANGA
DUMURIA
KOTWALI
BANGLADESH
Bay of Bengal
5 0 5 10 km
N
W
E
S
District Boundary
Upazila Boundary
District Head Quarter
Upazila/ Thana/H.Q.
Railway Station
Riverport
Ferry Ghat
National Highway
Regional Highway
Feeder Road
Broad Gauge Railway
Waterbody
River
সূত্র : বাংলা পিডিয়া, ২০০৩

সূচনা

খুলনা জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে রূপসা নদীর তীরে অবস্থিত। এর উত্তরে যশোর ও নড়াইল, পূর্বে বাগেরহাট, পশ্চিমে সাতক্ষীরা জেলা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। যশোর-মংলার মধ্যভাগে অবস্থিত খুলনা শহর বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম এবং দ্বিতীয় নদী বন্দর শহর। একদিকে বিভাগীয় শহর, অন্যদিকে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কাঁচামালের প্রাচুর্য, শিল্প কলকারখানা একে শিল্প নগরীর মর্যাদা এনে দিয়েছে। অদূরে মংলা বন্দর স্থাপিত হওয়ায় এটি বন্দর নগরী। খুলনা জেলা সমগ্র খুলনা বিভাগের সদর দফতর এবং দেশের তৃতীয় বৃহত্তম শিল্প নগরী। জেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য নগরায়ন। একযোগে নৌ, রেল, সড়ক ও আকাশ পথ, বিদ্যুৎ, গৃহায়ণ, অবকাঠামো, পয়ঃ ও পানি সুবিধাসহ শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশ খুলনার নগরায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। বর্তমানে খুলনা শহর দেশের চারটি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি এবং এই গুরুত্বপূর্ণ জনপদের পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন বা বিকাশের ইতিহাস সুদীর্ঘ।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে বর্তমান খুলনা জেলা ভাঙ্গা নামের বদ্বীপ অঞ্চলের অংশ ছিল। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রণীত টলেমী'র মানচিত্রে গঙ্গা, ভাগিরথী ও পদ্মার ব-দ্বীপের দক্ষিণ অংশে খুলনার অবস্থান দেখানো হয়। ইতিহাস অনুসারে চতুর্থ শতাব্দীতে ভাঙ্গা রাজ্যের অংশ হিসেবে খুলনাঞ্চল উত্তর ভারতের গুপ্ত রাজ্যের সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের (৩৪০-৩৮০ খ্রি:) অধীনে চলে যায় এবং পর্যায়ক্রমে তারই বংশধরদের অধীনে ছিল ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত। এর পরে ৭ম শতাব্দীতে গৌড়ের শাসক শশাংক খুলনার শাসনভার লাভ করেন। বিভিন্ন হিন্দু রাজ-রাজাদের শাসনামলে থাকার পর ১৫ শতাব্দীর মধ্যভাগে খুলনা মুসলমান শাসকের অধীনে আসে। এরপর ষোড়শ শতাব্দীতে মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে থাকার পর ইংরেজ শাসনাধীনে যায়।

ইংরেজ শাসনামলে যশোর জেলার একটি উপ-বিভাগ ছিল খুলনা। এই প্রসঙ্গে স্যার জেম্‌স ওয়েস্টল্যান্ড ১৭৭০ সালে যশোরের উপর তার লিখিত একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন : "নিহালপুরে মি: রেনীর জমিদারী প্রথার যথার্থ তলব করার উদ্দেশ্যেই মূলত খুলনা উপ-বিভাগ গঠিত হয়। কেননা, তার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন উপেক্ষা করে জমিদারী পরিচালনার জোরালো অভিযোগ ছিল"। এটি ১৮৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত অবিভক্ত বাংলার প্রথম উপ-বিভাগ। পরে এটি খুলনা সদর উপ-বিভাগ ও বর্তমানের বাগেরহাট জেলা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। খুলনা জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮১ সালের ১লা মে। এর আগে এটি যশোর জেলার একটি মহকুমা ছিল। পরবর্তীতে ১৯৬১ সালে তৎকালীন খুলনা, যশোর, বাকেরগঞ্জ ও কুষ্টিয়া জেলা নিয়ে খুলনা বিভাগ সৃষ্টি হয়।

লোকজ ঐতিহ্য মতে হিন্দু পুরাণের জনপ্রিয় নায়িকা 'খুল্লনা'-র সাথে এর নামকরণের ইতিহাস জড়িত। কবি কংকনের চন্ডীকাব্যের উদ্ধৃতি অনুসারে খুলনা জেলার অজয় নদীর তীরে বসবাসকারী সওদাগর ধনপতির স্ত্রী খুল্লনা'র নাম থেকে খুলনা নামকরণের উৎপত্তি হয়েছে। এই ধনপতি কপিল মুনিতে কপিলেশ্বরী দেবীর মন্দিরের অনুকরণে ভৈরবের তীরে খুল্লনেশ্বরী নামে চন্ডীদেবীর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে এর নাম হয়ে যায় খুলনা। সেই খুল্লনেশ্বরী মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ এখনো আছে। উল্লেখ্য, খুলনার দক্ষিণ-পূর্বে ৩৭ মাইল দূরে কপিলমুনিতে 'খুল্লনা'-র আদি নিবাস ছিল। খুল্লনেশ্বরী মন্দির থেকেই তৎকালীন বণিক সমাজে চন্ডীদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়।

খুলনা জেলার মোট আয়তন ৪,৩৯৪ বর্গ কি.মি., যা সমগ্র বাংলাদেশের আয়তনের ২.৯%। এলাকার বিচারে এটি উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার মধ্যে আয়তনে ২য় স্থানে এবং বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪র্থ স্থানে রয়েছে। বর্তমানে খুলনা পৌর কর্পোরেশনের আয়তন ৪৬ বর্গ কি.মি.। খুলনা জেলায় রয়েছে ১৪টি উপজেলা, ২টি পৌরসভা, ৭১টি ইউনিয়ন, ৪৭টি ওয়ার্ড, ৯৬১টি মৌজা/মহল্লা ও ১,১০৬টি গ্রাম। বটিয়াঘাটা, দাকোপ, ডুমুরিয়া, দিঘলিয়া, কয়রা, পাইকগাছা, ফুলতলা, রূপসা, তেরখাদা, খালিশপুর, খানজাহান আলী, কোতোয়ালি, দৌলতপুর ও সোনাডাঙ্গাসহ খুলনার ১৪টি উপজেলা। এর মধ্যে আয়তনে ডুমুরিয়া (৪৫০ বর্গ কি.মি.) সবচেয়ে বড় এবং দৌলতপুর সবচেয়ে ছোট (৮ বর্গ কি.মি.) উপজেলা । উল্লেখ্য, বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিভিত্তিক সীমা নির্ধারণের জন্য তিনটি সূচক বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে জোয়ার-ভাটার প্রভাব, লোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস। এর ভিত্তিতে দাকোপ ও কয়রা এদের মধ্যে তীরবর্তী (Exposed Coast) উপকূলীয় এলাকা হিসেবে এবং বাকি ১২টি উপজেলা অন্তর্বর্তী উপকূলীয় (Interior Coast) এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

উপজেলা	১৪
পৌরসভা	২
ইউনিয়ন	৭১
ওয়ার্ড	৪৭
মৌজা/মহল্লা	৯৬১
গ্রাম	১,১০৬

এক নজরে খুলনা

	বিষয়া	একক	খুলনা	উপকূলীয় অঞ্চল	বাংলাদেশ	তথ্য সূত্র ও বছর
এলাকা/প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৪,৩৯৪	৪৭,২০১	১,৪৭,৫৭০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	উপজেলা	সংখ্যা	১৪	১৪৭	৫০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	৭১	১,৩৫১	৪,৪৮৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পৌরসভা	সংখ্যা	২	৭০	২২৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	৪৭	৭৪৩	২,৪০৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৯৬১	১৪,৬৩৬	৬৭,০৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গ্রাম	সংখ্যা	১,১০৬	১৭,৬১৮	৮৭,৯২৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	২৩.৫৭	৩৫০.৭৮	১২৩৮.৫১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	১২.৩৪	১৭৯.৪২	৬৩৮.৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	লাখ	১১.২৩	১৭১.৩৫	৫৯৯.৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	বর্গ কি.মি.	৫৩৭	৭৪৩	৮৩৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০৯.৯	১০৪.৭	১০৬.৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির আকার	গৃহ প্রতি জনসংখ্যা	৪.৮	৫.১	৪.৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	৪.৯৪	৬৮.৪৯	২৫৩.০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	২.৮৫	৩.৪৪	৩.৫	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬২	৪৭	৪২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪৪	৫০	৫৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪২	৩১	৩১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	প্রাথমিক স্কুল	সংখ্যা / ১০,০০০ জন	৯	৭	৬	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	রাস্তার ঘনত্ব	কি.মি./বর্গ কি.মি.	০.৪৭	০.৭১	০.৬৯	বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬ ও বি.বি.এস.,২০০৩
	বাজারের ঘনত্ব	বর্গ কি.মি. / সংখ্যা	১১৬	৮০	৭০	১৯৯৬ (বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬)
অর্থনীতি	মোট আয়	কোটি টাকা	৫৮,৪৬০	৬৭,৮৮০	২,৩৭,০৭৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	মাথাপিছু আয়	টাকা	২৩,১৩৫	১৮,১৯৮	১৮,২৬৯	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মক্ষম শ্রম শক্তি (১৫ বছর+)	হাজার	১,৪৪৩	১৭,৪১৮	৫৩,৫১৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মরত নারী (খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে)	% (১৫-৪৯ বয়সদল)	৩২	২৬	২৮	২০০১ (নির্পেটি, ২০০৩)
	কৃষি শ্রমিক	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৪০	৩৩	৩৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	জেলে	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	২৯	১৪	৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ	হেক্টর	০.০৫	০.০৬	০.০৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	দরিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	৫৫	৫২	৪৯	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
	অতি দরিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	২৬	২৪	২৩	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
শিক্ষা	প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু(%)	৯৬	৯৫	৯৭	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ৭ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৫৭	৫১	৪৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৬৩	৫৪	৫০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৫১	৪৭	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ১৫ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৬১	৫৭	৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৬৮	৬১	৫৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৫৩	৪৯	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
স্বাস্থ্য	গ্রামীণ পানি সরবরাহ (সক্রিয় টিউবওয়েল)	প্রতি গড় জনসংখ্যা	১৪৮	১১১	১১৫	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩)
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৮৭	৮৮	৯১	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৫৯	৪৬	৩৭	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	হাসপাতালের শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা (সরকারি)	জন/ শয্যা	২,১৩১	৪,৬৩৭	৪,২৭৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নবজাতক মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৫৯	৫১-৬৮	৪৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	<৫ বছর শিশু মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৯০	৮০-১০৩	৯০	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	অতি অপুষ্টির হার	%	৩	৬	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	ছেলে	%	৩	৪	৪	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মেয়ে	%	২	৮	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মাতৃ মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৫	৫	৫	১৯৯৮/৯৯ (স্বাস্থসেবা অধিদপ্তর, ২০০০)
	আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণকারী নারী	%	৫০	৪১	৪৪	২০০১ (নির্পেটি, ২০০৩)

জেলার অবস্থান

জাতীয় অবস্থার তুলনায় ভাল দিক

- খুলনা জেলার মাথাপিছু আয় ২৩,১৩৫ টাকা, যা জাতীয় আয় (১৮,২৬৯ টাকা) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (১৮,১৯৮ টাকা) তুলনায় বেশি।
- জেলার বার্ষিক আয় প্রবৃদ্ধির হার ৫.৫%, যা জাতীয় হার (৫.৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৫.৪%) চেয়ে বেশি।
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ক্রমানুসারে মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে জেলার অবস্থান ৫ম স্থানে।
- জেলার ভূমিহীনদের সংখ্যা ৪৯%, যা জাতীয় (৫৩%) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৪%) তুলনায় অনেক কম।
- ক্ষুদ্র কৃষকদের সংখ্যা ৫০%, যা জাতীয় (৫৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৮%) তুলনায় কম।
- জেলায় ১৫-৪৯ বয়সদলের ৩২% নারী খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে কর্মরত, যা জাতীয় (২৮%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৬%) তুলনায় বেশি।
- সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর) ৫৭%, যা জাতীয় (৪৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫১%) তুলনায় বেশি।
- জেলার মাত্র ৫৯% গৃহে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা আছে, যা জাতীয় (৩৭%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪৬%) তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলার মোট বিদ্যুৎ সংযোগের পরিমাণ ৪২%, যা জাতীয় (৩১) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৩১) তুলনায় অনেক বেশি।
- হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা ২,১৩১ জন, যা জাতীয় (৪,২৭৬) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪,৬৩৭) তুলনায় ভাল।
- জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৫০%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় বেশি ।
- শহুরে জনসংখ্যা ৫৩%, যা জাতীয় (২৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৩%) তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলার মোট আয়তনের ০.০৭% প্রত্যন্ত এলাকা বা দ্বীপাঞ্চল।
- রেল সংযোগ ও নৌ-বন্দরের উপস্থিতি।
- পর্যটনের দিক থেকে সবচেয়ে আকর্ষণীয়।
- মাঝারি মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতা।
- খনিজ ক্ষেত্রের অবস্থান ও তেল/গ্যাস ক্ষেত্রের সম্ভাবনা।

জাতীয় অবস্থার তুলনায় দুর্বল দিক

- জেলার মোট আয়ে শিল্পখাতের অবদান ২১%, যা জাতীয় (২৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২২%) হারের তুলনায় কম।
- জেলার দারিদ্রপীড়িত ও অতিদরিদ্র গৃহস্থালির সংখ্যা যথাক্রমে (৫৫% ও ২৬%), যা জাতীয় (৪৯% ও ২৩%) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (৫২% ও ২৪%) তুলনায় বেশি।
- রাস্তার ঘনত্ব ০.৪৭ কি.মি./বর্গ কি.মি., যা জাতীয় (০.৬৯ কি.মি./বর্গ কি.মি.) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (০.৭১ কি.মি./বর্গ কি.মি.) চেয়ে কম।
- জেলার গড়ে প্রতি ১১৬ বর্গ কি. মি. এলাকাতে একটি হাট-বাজার কেন্দ্র আছে, যা জাতীয় (৭০ বর্গ কি. মি. এ একটি) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮০ বর্গ কি. মি. এ একটি) তুলনায় অপ্রতুল।
- জেলার মোট গৃহের ৮৭% কল বা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত, যা জাতীয় হারের (৯১%) তুলনায় কম ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮৫%) তুলনায় বেশি ।
- জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৯ জন, যা জাতীয় (৪৩ জন) হারের তুলনায় অনেক বেশি এবং সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের বিবেচনায় প্রায় সমান (৫১-৬৮ জন)।

উপজেলা তথ্য সারণী

বিষয়		একক	খুলনা	উপজেলা					
				বটিয়াঘাটা	দাকোপ	ডুমুরিয়া	দিঘলিয়া	কয়রা	পাইকগাছা
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৪,৩৯৪	২৪৮	৯৯২	৪৫৪	৭৭	১৭৭৫	৪১১
	ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	সংখ্যা	১১৮	৭	১০	১৪	৪	৮	১৯
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৯৬১	১৩২	২৬	২০৫	২৯	৭৪	১৮৪
	গ্রাম	সংখ্যা	১,১০৬	১৬৬	১০৭	২৩৮	৪২	১৩০	২০৩
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	২৩.৫৭	১.৩৯	১.৫৭	২.৭৫	১.১৪	১.৯২	২.৪৬
	পুরুষ	লাখ	১২.৩৪	.৭১	.৮৩	১.৪২	.৬২	.৯৫	১.২৭
	নারী	লাখ	১১.২৩	.৬৮	.৭৩	১.৩৩	.৫২	.৯৬	১.১৮
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	জন/বর্গ কি.মি.	৫৩৭	৫৬২	১৫৯	৬০৭	১,৪৮৩	১০৮	৬০০
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০৯.৯	১০৪	১১৪	১০৭	১১৯	৯৯	১০৭
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	৪.৯৪	.২৯	.২৯	.৫৭	.২৩	.৩৭	.৫১
	গৃহস্থালির আকার	জন/গৃহস্থালি	৪.৮	৪.৬৭	৫.৩২	৪.৭৬	৪.৯২	৫.১৪	৪.৭৭
	নারী প্রধান গৃহ	মোট গ্রামীণ কৃষিজীবী ঘরের%	২.৮৫	১.৭	২.১	১.৫	-	১.২	১.৮
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়াল সম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬২	৬৭	৫৬	৮৫	৫০	৮১	৭৯
	টেকসই ছাদ সম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪৪	১৭	৯	৩৯	৩৯	৫	২৬
	বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৩৩	২.৬২	৪.৫৫	৭.৩০	৪৪.৬১	০.২১	৩.০৬
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১,৯৮২	১৩০	১২১	২২৩	৬৮	১৬৫	১৮২
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	৩৬৪	২৬	৩১	৫৬	১৫	৩৫	৫০
	মহাবিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	৫৮	৫	৪	৮	২	২	৬
অর্থনীতি	কৃষি শ্রমিক	মোট গৃহস্থের (%)	৪০	৩০	২৮	২২	-	৪১	২৫
	কৃষি প্রধান পরিবার	মোট গৃহস্থের (%)	৬৯	৬৬	৬৮	৭৫	-	৭০	৬১
	অকৃষি প্রধান পরিবার	মোট গৃহস্থের (%)	৩১	৩৪	৩২	২৫	-	৩০	৩৯
	মোট চাষের জমি	হেক্টর	১,১১,২৯৭	১৪,৯৮৭	১৮,৪৮৩	২৭,৪৬৫	-	১৪,৮৯০	২০,৫৭১
	এক ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	-	৮৮	৯৩	৩৭	৩৭	-	৭৬
	দো ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	-	১১	৭	৩৩	৪৮	-	১৯
	তিন ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	-	১		৩০	১৫	-	৫
	প্রতি ০.০১ হেক্টর জমির মূল্য	টাকা	১২,০০০	৫,০০০	২,৫০০	১৩,০০০	১০,০০০	৪,০০০	৯,০০০
শিক্ষা	সাক্ষরতার হার ৭ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৫৭	৫২	৫১	৪৯	৫৫	৩৮	৪৪
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু (%)	৯৬	৯৯	৯৮	১০০	৯০	৯৪	৯৭
	মেয়ে	৬-১০ বছর শিশু (%)	৯৮	১০৫	১০০	১০০	১০২	৯৪	১০০
স্বাস্থ্য	সক্রিয় টিউবওয়েল	সংখ্যা	১৫,৮০৭	১,৮১১	৭৭৫	৩,৩৬৬	১,৫৬৭	৯৬৪	২,৫৯৯
	নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	%	৮৭	৯৫	৪৬	১০০	৯৯	৩১	৮৪
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	%	৩০	৬	৬	৯	২৩	৩	৯

তথ্য সূত্র ও বছর	উপজেলা							
	সোনাডাঙ্গা	দৌলতপুর	কোতোয়ালি	খানজাহান আলী	খালিশপুর	তেরখাদা	রূপসা	ফুলতলা
২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)	৯	১৫	১২	২৫	১৩	১৮৯	১২০	৫৭
২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)	৯	৭	১২	৪	১০	৬	৫	৩
২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)	৪৫	৩৬	৬৩	১১	৪২	৩২	৬৪	১৮
২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)		২	-	১৬		৯৫	৭৮	২৯
২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)	১.৭৫	১.২৭	২.৫১	.৯১	২.৪২	১.০৯	১.৬১	.৭১
২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)	.৯৩	.৬৭	১.৩৪	.৪৯	১.৩০	.৫৫	.৮৩	.৩৬
২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)	.৮২	.৬০	১.১৬	.৪২	১.১১	.৫৪	.৭৮	.৩৫
২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)	১৯,২৮৩	৮,৫৯০	২০,৫৮৫	৩,৬৪৬	১৯,২৫৫	৫৭৮	১,৩৪৭	১,২৬৭
২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)	১১৩	১১২	১১৬	১১৭	১১৮	১০২	১০৭	১০৩
২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)	.৩৮	.২৮	.৫৩	.১৯	.৫৪	.২১	.৩৫	.১৫
২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)	৫.৬১	৪.৫১	৪.৭০	৪.৭৭	৪.৪৩	৫.১৮	৪.৬২	৪.৭২
১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)	-	-	-	-	-	১.৫	-	০.৯
১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)	৪৯	৪৮	৫১	৬৪	৫১	২৭	৪৮	৭৯
১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)	৪২	৪০	৪২	৪৯	৪৬	৫১	৩০	৬১
১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)	৮১.০৩	৭২.৮৮	৭৮.৮৯	৬৫.৪৭	৮২.৭৮	৩.৪৮	২৯.৪৩	১৭.৬১
২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)	-	-	২২০	-	-	১০৫	৮৪	৭৭
২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)	২০	১৭	৩১	১১	২৩	১৫	২২	১২
২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)	৬	৪	৬	২	৪	২	৪	৩
১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)	-	-	-	-	-	২৭	-	১০
১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)	-	-	-	-	-	৭৮	-	৫৮
১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)	-	-	-	-	-	২২	-	৪২
১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)	-	-	-	-	-	১১,২৬৭	-	৩,৬৩১
২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)	-	-	-	-	-	৬২	-	৩৩
২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)	-	-	-	-	-	৩৬	-	৪৩
২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)	-	-	-	-	-	২	-	২৪
২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)	১,৮৬,০০০	৭৪,০০০	১২,৩৬,০০০	৭৫,০০০	৭৪,০০০	২,৫০০	৪,৫০০	৬,০০০
২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)	৬৯	৬৬	৭৬	৭১	৭৬	৪৩	৫৩	৫২
২০০১(প্রা.শি.অ)	-	-	৯১	-	-	৯৮	১০৩	১১২
২০০১(প্রা.শি.অ)	-	-	৯২	-	-	৯৮	১০৪	১১২
২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই, ২০০৩)	-	-		-	-	১,৫৪৩	১,৭৪২	১,৪৪০
১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)	৯৮	৯৮	৯৯	৯৬	১০০	৮৩	৯৩	৯৮
১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)	৭৬	৫৯	৭০	৪৮	৭৪	৮	২১	২৯

প্রকৃতি ও পরিবেশ

ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন/সুন্দরবন, জোয়ার-ভাটার জলাভূমি বা নদী মোহনা, নালা, খাল-বিল, চরাঞ্চল এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ- এ সবই খুলনা জেলাকে উপকূলীয় অঞ্চলে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, জেলার কৃষি ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। কেননা এখানকার কৃষির ধরন গড়ে উঠেছে ভূমি বৈচিত্র্য ও পানি-মাটির লবণাক্ততাকে কেন্দ্র করে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

বনভূমি : খুলনা জেলার অন্যতম প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, যার মোট আয়তন ১,৮১,৬০০ হেক্টর বনাঞ্চল বলতে সুন্দরবনই প্রধান। বিশ্বের বৃহত্তম এই ম্যানগ্রোভ বন খুলনা জেলার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার প্রধান নিয়ামক।

সুন্দরবন : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের কূলঘেঁষে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বরিশাল, পটুয়াখালী, পিরোজপুর ও বরগুনা জেলার মোট ৬,০১৭ বর্গ কি.মি. এলাকায় সুন্দরবনের অবস্থিতি। আন্তঃসীমান্ত এই বনভূমির মোট ৪,২৬৪ বর্গ কি.মি. পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৪.২% এবং সমগ্র বনভূমির ৪৪% এই সুন্দরবন। সুন্দরবনের মোট আয়তনের ৬৭% স্থলভাগ এবং ৩১% জলভাগ। এখানে রয়েছে তিনটি অভয়ারণ্য। আর তাই এই তিনটি এলাকাকে ১৯৭৭ সালের ৬ ডিসেম্বর জাতিসংঘের ইউনেস্কো মিশন পৃথিবীর ৫২২তম 'বিশ্ব ঐতিহ্য' এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে। উল্লেখ্য সুন্দরবনের মোট আয়তনের ২৩% হল বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা।

এই বিশাল ম্যানগ্রোভ বন খুলনার পশ্চিমে হরিণভাঙ্গা-রায়মঙ্গল-কালিন্দী নদীর মধ্য দিয়ে ভারতের দিকে প্রশস্ত। সুন্দরবনের পূর্ব বেষ্টনী খুলনা জেলার পূর্ব সীমারেখা অতিক্রম করে বাগেরহাট পর্যন্ত এবং পশ্চিম বেষ্টনী জেলার পশ্চিমের সীমারেখা ছাড়িয়ে সাতক্ষীরা জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। বনের দক্ষিণ সীমানা বঙ্গোপসাগরে মিলেছে। খুলনা জেলার দাকোপ, পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলায় সুন্দরবনের বিস্তৃতি এবং খুলনা ফরেস্ট রেঞ্জ-এর সদর দফতর নলিয়ান। খুলনা রেঞ্জের আওতায় ৫টি স্টেশন অফিস, ১০টি টহল ফাঁড়ি, ১টি অভয়ারণ্য, ৪টি টিম্বার কূপ, ৩টি গোলপাতা কূপ ও ১টি গরাণ কূপ রয়েছে। সুন্দরবনে মোট ৪টি গেজেটেড সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। খুলনার সংরক্ষিত বনাঞ্চল, দক্ষিণ সুন্দরবনের বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য, সুন্দরবনের রামাসার সাইট এবং বন্যপ্রাণীর 'বিশ্ব ঐতিহ্য' স্থান।

সুন্দরবন : বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন

অবস্থান	২১°৩৭-২২°৩০ উঃ এবং ৮৯°০২-৮৯°৫৩
প্রশাসনিক সদর দফতর	খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা
সংরক্ষিত এলাকা	সংরক্ষিত বনাঞ্চল, দক্ষিণ সুন্দরবনের বন্য প্রানীর অভয়ারণ্য, সুন্দরবনের রামাসার সাইট এবং 'বিশ্ব ঐতিহ্য' স্থান
ভূ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য	গাঙ্গেয় জোয়ার-ভাটার নদী, প্লাবণ ভূমি, ধুসর পলি মাটি ও অম্লীয়
বার্ষিক বৃষ্টিপাত	২,০০১ - ২,৯১৫ মি.মি.
তাপমাত্রা	সর্বোচ্চ ৩১.১° সে. এবং সর্বনিম্ন ২২.৬° সে. (২০০১)
আর্দ্রতা	৮১%
ইকোসিস্টেম	প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন
জীববৈচিত্র্য	রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ডলফিন, চিত্রা হরিণ, কুমীর, কচ্ছপ
উদ্ভিদ বৈচিত্র্য	সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, সাদা বাইন, গোলপাতা, হেতাল ইত্যাদি।
প্রধান সমস্যা	সুন্দরী গাছের আগামরা রোগ, গাছের পুণর্জন্ম, জীব প্রজাতি হ্রাস, বন উজাড়।

এ ছাড়া খুলনায় মৎস্য অভয়ারণ্য স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। সুন্দরবনের জলবায়ু নিরক্ষীয় সামুদ্রিক ধরনের। তাই এখানে ভারী মৌসুমী বৃষ্টিপাত ও গরম আর্দ্র আবহাওয়া অনুভূত হয়। শীতের তীব্রতা কম, মৃদু এবং শুষ্ক।

উল্লেখ্য ১৮২৮ সালে ব্রিটিশ সরকার সুন্দরবনের মালিকানা অর্জন করে এবং ১৮২৯ সালে এখানে সর্বপ্রথম জরিপ চালানো হয়। সুন্দরবন ১৮৮৬ সালের আগ পর্যন্ত অঞ্চলটি জমিদারদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তবে, ১৮৭৮ সালেই ব্রিটিশ সরকার সুন্দরবনকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা দেয় এবং ১৮৭৯ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের বনবিভাগের উপর সুন্দরবনের দায়িত্ব দেয়া হয়। মোগল অধ্যায়ে শাহ্ সুজার আমলে অর্থাৎ ১৮৭৫-১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম সুন্দরবন থেকে রাজস্ব আদায় শুরু হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বন বিভাগের আওতায় মোট রাজস্ব আয়ের ৫০% আসে সুন্দরবন থেকে।

নদ-নদী : অসংখ্য নদী-নালা খুলনা জেলায় জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। জেলার অর্থনীতিতে এই নদীগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৌপথ প্রধান ভূমিকা পালন করে। জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত কয়টি প্রধান নদী হল ভদ্রা, ভৈরব, রূপসা, শিবসা, পশুর, কাজীবাছা, শিবসা, কপোতক্ষ, আতাই, শোলমারী এবং সুতারখালী। প্রধান এই নদীগুলো আবার অসংখ্য শাখা নদী , নালা, খাল ও খাঁড়ি দিয়ে বঙ্গোপসাগরের সাথে যুক্ত। এ সব নদীতে সারা বছর ধরে জোয়ার-ভাটা খেলে এবং নাব্যতা থাকে। জেলার মোট নদী ৬০ বর্গ কি.মি. যা সমগ্র জেলার আয়তনের ১.৩৬%।

ভদ্রা নদী : ১৯০ কি.মি. দীর্ঘ ভদ্রা নদী যশোর জেলার ঝিকরগাছার কপোতাক্ষ নদ থেকে উৎসারিত হয়েছে । যদিও এটি বর্তমানে কপোতাক্ষ নদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলা অতিক্রম করে যশোর-খুলনা জেলার সাধারণ সীমানা দিয়ে ৮ কি.মি. পরে খর্নিয়ার কাছে হরিপুর নদীর সাথে মিলে ভদ্রা নামে খুলনায় প্রবেশ করেছে । জনশ্রুতি রয়েছে যে, যাত্রাপথে কোন ভাঙন বা বিপর্যয় সৃষ্টি না করার কারণে এর নামকরণ করা হয় ভদ্রা। পূর্ব দিকে ভদ্রার যে অংশটি বালাবগী হয়ে সুন্দরবনের ৫০ কি.মি. দক্ষিণে শিবসা নদীতে পড়ত সেটি এখন মরা ভদ্রা নামে পরিচিতি। বর্তমানে সুতারখালী নদী দিয়ে ভদ্রার মূল স্রোত প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, খুলনা-যশোর জেলার প্রায় ২৫০০ বর্গ কি.মি. এলাকার নিষ্কাশন এই নদীপথে হয়ে থাকে। নদীর উভয় তীরে লবণাক্ততা প্রতিরোধ বাঁধ থাকা সত্ত্বেও খুলনা অংশে এই নদীর পানি সেচ কাজের উপযোগী নয়। তবে চিংড়ি চাষে ভদ্রার পানি নালার মাধ্যমে চিংড়ি ঘেরে নেয়া হয়। খর্নিয়ার কাছে ভদ্রার গড় প্রশস্ততা প্রায় ২৫০ মিটার।

প্রধান নদী	**ভদ্রা, ভৈরব, রূপসা, শিবসা, পশুর, কপোতাক্ষ**
সুন্দরবনের নদী ও খাল	**পশুর, রায়মঙ্গল, হাড়িয়াভাঙ্গা, বলেশ্বর, শিবসা, হরিণভাঙ্গা, বাঙ্গুয়া, ধুন্দলী, কোকিলমণি, শ্যামা**
নদীর দৈর্ঘ্য	**৬০ বর্গ কি.মি.**
উৎপত্তি স্থান	**উজানের নদী ও ভারত সীমান্ত**
মোহনা	**রায়মঙ্গল, মালঞ্চ, মারজাটা, হরিণঘাটা**

ভৈরব : ২৪৮ কি.মি. দীর্ঘ আন্তঃসীমান্ত নদী ভৈরব মালদহ থেকে উৎসারিত হয়ে দক্ষিণে জলঙ্গী নদীর সাথে মিলিত হয়ে মেহেরপুরের পশ্চিমে মাথাভাঙ্গায় মিশেছে। এরপর দর্শনা রেলস্টেশনে বিভক্ত হয়ে যশোরের মধ্য দিয়ে দক্ষিণে নিম্নগামী হয়ে খুলনায় পড়েছে। এটি খুলনার কিছু অংশে ভারত ও বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারণ করেছে। কালিগঙ্গার পর কৈখালি পর্যন্ত এটি কালিন্দী নামে পরিচিত এবং পূর্বে মোহনার কাছে এটি রায়মঙ্গল নামে এবং পশ্চিমে হাড়িয়াভাঙ্গা মোহনা দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। খুলনা ও যশোরের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এই ভৈরব নদীর কল্যাণে গড়ে ওঠে। কেননা অত্যন্ত গভীর, খরস্রোতা ও জীবন্ত এই নদীটির দুই ধারে অসংখ্য জনপদ গড়ে ওঠে।

সুফী সাধক হযরত খান জাহান আলী এই নদী পথেই গৌড় হতে খুলনার বড়বাজার হয়ে বাগেরহাট যান। এটি একটি তীর্থ নদী হিসেবে সম্রাট আকবরের আমলে যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যকে দমন করার জন্য পরিচিত। মোগল সেনাপতি মানসিংহ বিশাল বাহিনী নিয়ে এই নদী অতিক্রম করেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। এক সময় সিন্ধু নদের মতই এর মানমর্যাদা ছিল।

শিবসা : ১০০ কি.মি. দীর্ঘ সুন্দরবনের জোয়ার-ভাটার নদী শিবসার উৎপত্তি খুলনার রাড়লীর কাছে কপোতাক্ষ নদ থেকে। এরপর ৩ কি.মি. পূর্বে প্রবাহিত হয়ে পাইকগাছা অতিক্রম করে এটি হাড়িয়া নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। অর্থাৎ উৎপত্তির পর প্রায় ২৭ কি.মি. পাইকগাছা উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবশিষ্ট পথ পাইকগাছা ও দাকোপ উপজেলার সীমা নির্ধারণ করে প্রবাহিত হয়েছে। ভরা বর্ষা ছাড়া সারা বছরই এই নদীর পানি লবণাক্ত থাকে। শিবসার তীরে হাটবাজার, সুন্দরবনের বিখ্যাত শেখেরট্যাক ও কালীবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ এখনো রয়ে গেছে। এর পশ্চিমের তীরে কিছু দ্বীপ জঙ্গলে পরিণত হয়েছে।

পশুর : ১৪২ কি.মি. দীর্ঘ পশুর নদী সুন্দরবনের সবচেয়ে বড় নদী। এখন এর প্রবাহ ও নাব্যতার উপর ভৈরব, রূপসা, কাজীবাচা অর্থাৎ সমগ্র নদী ব্যবস্থা জড়িত। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ এবং এই নদীপথেই খুলনা-বরিশালে লঞ্চ ও স্টিমারসহ অন্যান্য নৌযান চলে। এর তীরে মংলা সমুদ্রবন্দর অবস্থিত। খুলনার দক্ষিণে কাজীবাচা নামে এক শাখা নদী পশুর নদীর সাথে মিলেছে যা থেকে ভৈরব নদীর দূরত্ব মাত্র ৫ কি.মি.। জনশ্রুতি মতে, ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে নড়াইল জেলার ধোনদা গ্রামের লবণ ব্যবসায়ী জনৈক রূপচাঁদ সাহা নৌকায় যাতায়াতের সুবিধার জন্য ভৈরব ও কাজীবাজারের সাথে খাল খননের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করেন। আর তার নামানুসারে এই খালের নাম হয় রূপসা। সেই সময়ের খাল রূপসা পরবর্তীতে ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে বর্তমানের রূপসা নদীতে রূপান্তরিত হয়।

কপোতাক্ষ : ১৬০ কি.মি. দীর্ঘ কপোতাক্ষ নদ মাথাভাঙ্গা হতে দর্শনার কাছে উৎসারিত হয়ে করে যশোর ও খুলনার মধ্যে দিয়ে দক্ষিণে সুন্দরবনের মধ্যে খোলপটুয়া নদীর সাথে মিশেছে। নদীটি তাহেরপুরের কাছে ভদ্রা ও ভৈরব এবং দেবু দুয়ারের কাছে মরীচাপ নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই মিলিত স্রোত জায়গীর মহালের কাছে কচুয়া নদীতে মিশে আড়পাংগাসিয়া নামে মালঞ্চ নদীর সাথে মিশে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। খুলনার অংশে নদীটি নাব্য। এতে লবণাক্ততা প্রতিরোধের জন্য বাঁধ দেয়া হয়েছে। কপোত বা পাখির অক্ষের মতো স্বচ্ছ পানির জন্য এর নামকরণ করা হয় কপোতাক্ষ।

উল্লেখ্য পশুর, রায়মঙ্গল, হাঁড়িয়াভাঙ্গা, বলেশ্বর, শিবসা, হরিণভাঙ্গা, বাঙ্গুয়া, ধুন্দলী, কোকিলমনি, শ্যামা ইত্যাদি নদী সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত প্রধান কয়টি নদী এবং খাল।

মোহনা : অপরূপ প্রাকৃতিক ও প্রাণের বৈচিত্র্যে ভরা মোহনা মানুষকে কাছে টানে। রায়মঙ্গল, মারজাটা এবং হরিণঘাটা জেলার তিনটি মোহনা।

রায়মঙ্গল : রায়মঙ্গল খুলনা জেলার সর্ব পশ্চিমের একটি মোহনা, যা কালীগঞ্জের নীচ থেকে খুলনা জেলা ও ভারতের চব্বিশ পরগনার সীমা নির্ধারণ করেছে। এটি সমুদ্র থেকে ৯.৬ কি.মি. দূরে তিনটি নদীর মিলন স্থানে গঠিত হয়েছে। পশ্চিমের হরিণভাঙ্গা কেন্দ্রে রায়মঙ্গল ও পূর্বে যমুনা নদীর তিন স্রোতের মিলন স্থানই হল এই রায়মঙ্গল মোহনা। এটি সারা বছর ধরে মোটামুটি নাব্য থাকে। রায়মঙ্গল থেকে ৬ - ৯ কি.মি. দূরে মালঞ্চ মোহনা এবং পূর্বে কয়েক মাইল পরেই বড় পাঙা এবং কয়টি নালা এটিকে মালঞ্চ মোহনা ও পাতনি দ্বীপ থেকে পৃথক করেছে। এই স্থানেই ১৭৬৬ সালে Falmouth জাহাজ ডুবে যায়। বলা হয় Mollinchew থেকে মালঞ্চ নামের উৎপত্তি।

মারজাটা : মারজাটা মোহনা যা পাতনি দ্বীপ থেকে পূর্বে অবস্থিত। এই মোহনার প্রবেশ মুখ প্রায় ৪-৫ মাইল প্রশস্ত। এই মোহনার ভেতরে দুটো দ্বীপ আছে। যা পারভাঙ্গা দ্বীপ নামে পরিচিত। এখানে ১৭৯১ সালে Berkshire

জাহাজডুবি হয় বলে জানা যায়। মারজাটা মোহনার ১৬ কি.মি. দূরে উত্তর-পূর্বে অপেক্ষাকৃত ছোট প্রবেশ মুখের বাঙরা মোহনা অবস্থিত।

হরিণঘাটা : খুলনার সর্ব পূর্বের মোহনার নাম হরিণঘাটা, যা বাঙরা থেকে ২৪ কি.মি. উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এই মোহনার প্রবেশ মুখ প্রায় ১৪ কি.মি. প্রশস্ত ও দুই তীর থেকে ভূখণ্ড স্পষ্ট দেখা যায়। এটি বাগেরহাটের অংশে পড়েছে। ১৮৬৩ সালে এই স্থানটি নদী বন্দর হিসেবে ঘোষিত হয়। কিন্তু, পরবর্তীতে এটি বাণিজ্যে আকর্ষণ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়।

বিল : দৌলতপুর ও ডুমুরিয়া উপজেলার বিল ডাকাতিয়া, বিল পাবলা, মাধবকাঠি ও জলমা বিল জেলার উল্লেখযোগ্য কয়টি বিল। মৎস্য অধিদফতর (২০০২)-এর সূত্রানুসারে, খুলনা জেলায় মোট বিল এলাকার পরিমাণ ৩৬৫ হেক্টর, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের বিল এলাকা (১১,৫১২ হেক্টর)-র ৩২%। বিল ডাকাতিয়া আয়তনে সবচেয়ে বড়।

প্রধান বিল	বিল ডাকাতিয়া, মাধবকাঠি, জলমা, বিল পাবলা
আয়তন	৩৬৫ হেক্টর
% (উপকূলীয় অঞ্চল)	৩২%
সবচেয়ে বড় বিল	বিল ডাকাতিয়া

বিল ডাকাতিয়া : বিল ডাকাতিয়া খুলনা জেলার উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত। এই বিল পোল্ডার-২৫-এর জলাবদ্ধ এলাকা এবং ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলার প্রশাসনিক বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। এই পোল্ডার এলাকার আয়তন ১৯,৪৩০ হে.। এর মধ্যে ৫০% অর্থাৎ প্রায় ৯,০০০ হে. এলাকা ০.৫ মিটার থেকে ২ মিটার পানিতে নিমজ্জিত ছিল। এটি গাঙ্গেয় জোয়ার-ভাটার বদ্বীপ অংশে পড়েছে। প্রায় ১৫ বছর ধরে এখানে জলাবদ্ধতা এবং পানি নিষ্কাশনজনিত সমস্যা বিরাজ করছে। সামগ্রিক প্রতিবেশের ভারসাম্য উপেক্ষা করে অপরিকল্পিত পোল্ডার নির্মাণ এই বিপর্যয়ের মূল কারণ।

সমগ্র বিল ডাকাতিয়া এলাকার নিষ্কাশন শোলমারী, হামকুড়া, হরি, সালতা ও ভদ্রা নদীর উপর নির্ভরশীল। তাই এসব নদীর উপরের অংশে হঠাৎ পানি প্রবাহ কমে যাওয়া, বেড়িবাঁধ ও স্লুইসের অপর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ, প্রভাবশালী চিংড়ি চাষীদের ঘের এলাকার পানি প্রবাহ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি কারণে বিল ডাকাতিয়ার জলাবদ্ধতা দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিয়েছে। বর্তমানে ৬টি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে অন্যান্য গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রায় দশটি গ্রাম মূল ভূ-খণ্ড থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। শুধু তাই নয়, এলাকায় পানি ও পয়ঃকাঠামোগুলোরও আজ বেহাল অবস্থা, পানিবাহিত রোগে জনস্বাস্থ্য দুর্বল হয়ে পড়ছে। জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততার ক্রমবৃদ্ধি আর পলি সঞ্চয়নের ফলে সমগ্র জীববৈচিত্র্যে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। জলাবদ্ধতার কারণে এক কালের কৃষিনির্ভর অর্থনীতি আজ প্রায় বিলুপ্ত হবার পথে। কেননা প্রায় ৫৫% কৃষক পরিবার আজ জেলেতে রূপান্তরিত হয়েছে। বহু লোক নিজ এলাকা ছেড়ে অভিবাসী হতে বাধ্য হয়েছে।

বিল ডাকাতিয়া ঃ দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার মূর্ত প্রতিচ্ছবি

জলাবদ্ধ এলাকা	৯,০০০ হেক্টর
জলাবদ্ধতার কারণ	অপরিকল্পিত পোল্ডার নির্মাণ ও সামগ্রিক প্রতিবেশের ভারসাম্য উপেক্ষা, পানি প্রবাহ কমে যাওয়া, বেড়িবাঁধ ও স্লুইসের অনুপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ, চিংড়ি ঘের
জলাবদ্ধতার প্রভাব	পরিবেশগত বিপর্যয়, জনগণের দুর্দশাগ্রস্ত জীবন, ৫৫% কৃষক পরিবার জেলে পরিবারে রূপান্তর

তবে বর্তমানে বিল ডাকাতিয়ায় জলাবদ্ধতার আংশিক নিরসনে এলাকার জনজীবনের উন্নয়ন ও প্রকৃতির ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের চিত্র উল্লেখ করার মত। স্থানীয় জনমত অনুসারে বিল ডাকাতিয়ার বাস্তব অবস্থা জানতে প্রয়োজন একটি পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা। কেননা বিল ডাকাতিয়ায় পানি নিষ্কাশন পথ বা শোলমারী রেগুলেটরের বাইরে লোয়ার সালতা নদী পর্যন্ত ১৫০ মি. এলাকার পলি অপসারণ অতি জরুরি। এটি নিশ্চিত করতে না পারলে রামদিয়া রেগুলেটরের পরে নদীটি মরে যেতে পারে।

পুকুর : জেলার সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা ধরনের পুকুর, যা মোট এলাকা ৫,০১৭ হেক্টর, এর মধ্যে মাছ চাষ করা হয় ৪,১০১ হেক্টর পুকুরে, পরিত্যক্ত পুকুরের পরিমাণ ৩৯৯ হেক্টর।

মোট পুকুরের পরিমাণ	৫,০১৭ হে.
মাছ চাষের পুকুর	৪,১০১ হে.
মাছ চাষযোগ্য পুকুর	৫১৭ হে.
পরিত্যক্ত পুকুর	৩৯৯ হে.

চরাঞ্চল : খুলনা জেলার আরেকটি অন্যতম প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হল মূল ভূ-খণ্ডের সাথে সংযুক্ত চরাঞ্চল। জেলায় ছোট বড় মোট ১১টি উল্লেখযোগ্য চর এলাকা রয়েছে। এগুলো হল বাগালির চর, ভদ্রা নদীর চর, চুংকুড়ি চর, দাকোপ নদীর চর, দক্ষিণ বানিশান্তা চর, দাশলিয়া, হালিয়াবরনপাড়া, কয়রা নদীর চর, কুচা নদীর চর, তীল ভাঙ্গা ও জালিয়া খালি চর। এই চরাঞ্চলের মোট আয়তন প্রায় ৮৬ বর্গ কি.মি.। এর মধ্যে ভদ্রা নদীর চর আয়তনে সবচেয়ে বড় (প্রায় ২৪ বর্গ কি.মি.) এবং দাকোপ নদীর চর সবচেয়ে ছোট আয়তনের (মাত্র ০.০৫ বর্গ কি.মি.)। তবে, দক্ষিণ বানিশান্তা চরটি সবচেয়ে পুরানো এবং স্থায়ী। প্রায় ৬৫ বছর আগে এটি গঠিত হয়। অন্যদিকে, মাত্র ১৫ বছর আগে অপেক্ষাকৃত নতুন কুচা নদীর চর গঠিত হয়। আর তাই শিবসা নদীর পাড়ের এই নতুন চরে উল্লেখযোগ্য কোন কাঠামো নেই। এখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযুক্ত কাঠামোর অভাব রয়েছে। মাত্র একটি খেয়াঘাট ও ১ কি.মি. দীর্ঘ রাস্তা আছে। জেলে, কৃষক, দিনমজুর ও চিংড়ি চাষী এই চরগুলো র প্রধান জীবিকা দল। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাওয়ালী, মৌয়ালী আর চুনারিদের বসবাস। চরবাসীদের জীবনের অন্যতম প্রধান দুর্যোগ লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, জনসচেতনতার অভাব। চরের অর্থনৈতিক বিকাশের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হল নোনা পানি। ফসল আবাদের মৌসুমে নোনা পানির অনুপ্রবেশ কৃষিক্ষেত্রে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে। এ ছাড়া বেড়িবাঁধের অভাবে অমাবস্যা আর পূর্ণিমায় নদীর পানি উপচে পড়ে চরের জনপদে। বিপর্যস্ত হয় মানবজীবন, সম্পদ ও ঘরবাড়ি।

চরাঞ্চল	বাগালির চর, ভদ্রা নদীর চর, চুংকুড়ি চর, দাকোপ নদীর চর, দক্ষিণ বানিশান্তা চর, দাশলিয়া, হালিয়াবরন পাড়া, কয়রা নদীর চর, কুচা নদীর চর, তীল ভাঙ্গাঁ ও জালিয়া খালি চর
মোট আয়তন	৮৬ বর্গ কি.মি
প্রধান পেশা	মাছ ধরা, চিংড়ি চাষ, দিনমজুরি ও কৃষিকাজ
পেশা	বাওয়ালী, মৌয়ালী, চুনারি
দুর্যোগ	লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, সামাজিক নিরাপত্তা-উপযুক্ত কাঠামো অভাব
সম্ভাবনা	মাছ চাষ, নিবিড় বাগদা চাষ, গো-চারণ, কৃষি ও লবণ চাষ

জলবায়ু : খুলনা জেলার আবহাওয়া উষ্ণ। এখানে অতি উষ্ণ গ্রীষ্ম ও মৃদু শীতের প্রভাব বেশি। মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য জুলাই মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল এবং এই সময়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫° সে. পর্যন্ত উঠে। জানুয়ারিতে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২° সে.। বাতাসের আর্দ্রতা ৮৮%। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এটি জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বজায় থাকে। তবে ভূ-তাত্ত্বিক, ভৌগোলিক ও জলবায়ুজনিত কারণে জেলাটি ঘূর্ণিঝড়প্রবণ। সাধারণত গ্রীষ্মের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এখানে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। তবে সুন্দরবন একটি নিরাপদ বন বেষ্টনী হিসেবে জেলার জানমালের ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ করে অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে জনপদের তুলনায় সুন্দরবনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশি।

মাটি : খুলনা জেলার বিভিন্ন জায়গায় মাটিতে ভিন্নতা রয়েছে। সুন্দরবন, নদী-নালা এবং চরাঞ্চল খুলনার ভূ-

মাটির ধরন	নিম্ন গাঙ্গেয় নদী প্লাবনভূমি, গাঙ্গেয় নদী প্লাবনভূমি
প্রধান বৈশিষ্ট্য	বাদামী কালো পীট, গাঢ় ধূসর কাদামাটি এবং ধূসর পলিযুক্ত কাদামাটি

তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। জেলায় মূলত তিন ধরনের মাটি দেখতে পাওয়া যায়। বাদামী কালো পীট, গাঢ় ধূসর কাদামাটি এবং ধূসর পলিযুক্ত কাদামটি। জেলার উত্তরাংশের মাটি বাদামী কালো পীট ধরনের। জেলার মধ্যভাগে পুরানো গাঙ্গেয় জোয়ার-ভাটার বা বন্যা-প্লাবন এলাকার মাটি লবণাক্ত, গাঢ় ধূসর এঁটেলযুক্ত। অন্যদিকে, দক্ষিণাঞ্চলে সালফেট ধূসর পলিময় কাদামাটির আধিক্য দেখা যায়। উল্লেখ্য, খুলনার তীরবর্তী এলাকা ও বেসিন এলাকার মাটি পলিময় এঁটেল ধরনের। মাটির উপরের স্তর অম্লীয়। বনাঞ্চলের মাটি লবণাক্ত, এঁটেলযুক্ত এবং এখানে জোয়ার-ভাটার প্রভাব খুব বেশি। সুন্দরবনের মাটি ক্ষারধর্মী ও উচ্চ মাত্রায় উর্বর। অন্যদিকে বিল এলাকার মাটি এঁটেল ধরনের, পীট এবং পলিযুক্ত।

উল্লেখ্য, খুলনার উত্তর ভাগ এগ্রোইকোলজিক্যাল অঞ্চল ১১ ও ১২ অর্থাৎ গঙ্গার নদী প্লাবন উচ্চ ও নিম্ন এলাকার অন্তর্গত। আর সমগ্র খুলনা জেলা সামগ্রিকভাবে এগ্রোইকোলজিক্যাল অঞ্চল ১৩-তে পড়েছে। এগ্রোইকোলজিক্যাল জোন ১২ বা নিম্ন গাঙ্গেয় নদী প্লাবনভূমির মাটি উঁচু এলাকায় চুনযুক্ত ও নিম্ন এলাকায় কাদাযুক্ত, মৃদু মাত্রায় অম্লীয় এবং উর্বরতা মাঝারি ধরনের। অন্যদিকে এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোন ১৩ গাঙ্গেয় নদী প্লাবনভূমির মাটি পলিময় বালুযুক্ত। জলাভূমির মাটি কাদাযুক্ত পলিময়, যা উর্বর এবং অম্লীয়। জেলার পানিতে লবণের মাত্রা ৫ থেকে >১০ পি.পি.এম.। কিন্তু মাটির লবণাক্ততার মাত্রা পানির থেকে বেশি অর্থাৎ ৮ থেকে >১৫ পি.পি.এম।

উদ্ভিদ ও জীববৈচিত্র্য : খুলনা জেলার উদ্ভিদ বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে প্রথমেই সুন্দরবনের কথা চলে আসে। জেলার দক্ষিণে এক-তৃতীয়াংশের বেশি এলাকা জুড়ে রয়েছে এই সুন্দরবন। ম্যানগ্রোভ গাছপালা, লতা-গুল্ম, বাঁশ-বেত ঝোঁপ এই বনকে নিবিড় প্রাকৃতিক বেষ্টনীর রূপ দিয়েছে। ৩৩৪ প্রজাতির গাছ, ১৬৫ প্রজাতির শৈবাল এবং ১৩ প্রজাতির অর্কিড সুন্দরবনের উদ্ভিদ জগতকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে।

সুন্দরবনের অন্যতম প্রধান পরিবেশবান্ধব গাছ সুন্দরী । সুন্দরবনের ৪৭% গাছই সুন্দরী গাছ, যা বনের ৭৩ শতাংশ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। সুন্দরী কাঠের বার্ষিক উৎপাদন ৩ লাখ ঘনফুট। এ ছাড়াও ১৩ শতাংশে গেওয়া গাছ আর বাকি ১১ শতাংশ জুড়ে পশুর, গরান, কেওড়া, বাইন, সাদাবাইন, দুন্দল, কাঁকড়া, গোলপাতা, সিংরা, হেতাল, খলসী, হারগোজা, আমুর, ধানসি ইত্যাদি দেখা যায়। বাংলাদেশের মোট কাঠ সম্পদের ৬০% আসে সুন্দরবন থেকে এবং দেশের বনৌষধির চাহিদা পূরণে এদের গুরুত্ব অপরিসীম।

সুন্দরীর কাঠ দীর্ঘস্থায়ী এবং তা খুঁটি, ঘরবাড়ি তৈরিতে অতুলনীয়। আমুর ও দুন্দল ঘরের খুঁটি, হুক্কা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বাইন সুন্দরবনের দীর্ঘতম গাছ। যার স্বাভাবিক উচ্চতা ৬০ ফুট এবং প্রধানত জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাইন গাছের ফুল অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং এ থেকে মৌমাছিরা মধু আহরণ করে। এ ছাড়া গর্জন, গরান এবং কাঁকড়া গাছের কাঠ অত্যন্ত উঁচুমানের। গেওয়া গাছ দেয়াশলাই তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। কেওড়া গাছের পাতা ও ফল হরিণের প্রিয় খাদ্য। শিংড়া গাছ সর্বোৎকৃষ্ট জ্বালানি হিসেবে বহুল পরিচিত। সুন্দরবন

উদ্ভিদ বৈচিত্র্য	**৩৩৪ প্রজাতির গাছ, ১৬৫ প্রজাতির শৈবাল এবং ১৩ প্রজাতির অর্কিড**
প্রধান গাছ	**সুন্দরী, আমুর, দুন্দল, বাইন, গর্জন, গরান এবং কাঁকড়া**
প্রাণী বৈচিত্র্য	**৩৭৫ প্রজাতির বন্যপ্রাণী, ৩০০ প্রজাতির পাখি**
প্রধান প্রাণী	**রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, বানর, শেয়াল, কাঠবিড়ালী, বন বিড়াল, গেছো বিড়াল, সাপ ও কুমির**

ছাড়াও জেলার জলাভূমি অর্থাৎ প্রধানত বিল এলাকায় বহু ধরনের আগাছা জন্মে। গ্রামাঞ্চলে তাল ও বাঁশঝাড় দেখা যায়। ফলজ গাছের মধ্যে অন্যতম হল আম ও কাঁঠাল। ঘরের দরজা, জালানা, বাক্স তৈরিতে এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

সুন্দরবন জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এখানে প্রায় ৩৭৫ প্রজাতির বন্যপ্রাণী রয়েছে। এটি বিশ্ববিখ্যাত ও জাতীয় প্রাণী রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসভূমি। চিত্রা হরিণ আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রাণী। এখানে গাছে গাছে বানরদের অবাধ বিচরণসহ শেয়াল, কাঠবিড়ালী, বন বিড়াল, গেছো বিড়াল, উদ, গন্দগোকুল, খাটাশ, বাঘা বিড়াল, বন্য শূকর, মায়া হরিণ, মেঠো ইঁদুর, গেছো ইঁদুর ইত্যাদি দেখা যায়। সুন্দরবন নানা সরীসৃপ যেমন: গোখরা, কারাইত, রাজসাপ, অজগর, বাটাগুর/থেরাপিন, চোরা ও ঘাস সাপের জন্যও বিখ্যাত। নদী-মোহনায় কুমির, লবণ জলের কুমির, মেছো কুমির, ঘড়িয়াল, হাঙ্গড়, শুশুক, নীল তিমি, সবুজ কচ্ছপ, হলুদ কচ্ছপ, তিনাসির কচ্ছপ, ডলফিনের অবাধ বিচরণ চোখে পড়ে।

সুন্দরবনে ৩০০ প্রজাতির পাখি রয়েছে। বন্য পাখির মধ্যে বাজ, ঈগল, চিল, শকুন উল্লেখযোগ্য। জলাভূমিতে কানী বক, গো-বক, চাগা, ডুবুরী, মাছরাঙা, বাবুই, বুলবুলি, টিয়া, টেংগা, মদনটাক, চিটাঘুগু, হরিয়াল, চোখগেলো, কাঠঠোকরা, পানকৌড়ি ইত্যাদি পাখ-পাখালি দেখা যায়। বনাঞ্চলে ফুলে ফুলে প্রজাপতি, মথ, ভ্রমর, মাছির গুঞ্জন শোনা যায়।

নদী-মোহনা ও বিলের মাছ : জেলার নদী-মোহনা, বিল, খাঁড়ি ও নালা বহু ধরনের মাছে পরিপূর্ন। পাংগাস, ইলিশ, বাগার, চিতল, বোয়াল নদীর মাছ ও কালা বাউশ, রুই, কাতলা, মৃগেল, বোয়াল, শোল, কই, মাগুর ইত্যাদি বিল-খালের মাছ। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে চিংড়ি ও চান্দা অন্যতম। এ ছাড়াও ধান ক্ষেতে ভেটকি, ট্যাংরা, পাইশা মাছ জন্মে যারা অতিদ্রুত বর্ধনশীল। সাধারণত অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে ধানক্ষেত শুকাতে শুরু করলে এসব মাছ ধরা হয়। এ ছাড়া সুন্দরবনের নদী মোহনা ও খাঁড়ির মাছের মধ্যে ভেটকি, ইলিশ, জাবা, কাইবল, রেখা, চিংড়ি ইত্যাদিই প্রধান।

খনিজ সম্পদ

বৃহত্তর খুলনা জেলার একমাত্র খনিজ সম্পদ পিট কয়লা। তেরখাদা উপজেলার কলা মৌজা ও রামপাল উপজেলার গৌরাঙ্গ মৌজায় এই কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। এই পিট কয়লার স্তর ০.২৫ মিটার থেকে ৩ মিটার পুরু। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (১৯৯৯)- র হিসেব অনুসারে ৩৯ বর্গ কি.মি. এলাকায় এই কয়লার মজুদের পরিমাণ ৮ মিলিয়ন টন। এ ছাড়া উপকূলীয় এলাকায় তেল-গ্যাস ক্ষেত্রের উপস্থিতি ও সম্ভাবনার বিচারে পেট্রোবাংলা সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ২৩টি ব্লকে ভাগ করেছে ও এই মানচিত্রে সুন্দরবন ৫ ও ৭ ব্লকের অন্তর্ভুক্ত। আর তাই সম্প্রতি সুন্দরবন এলাকায় তেল, গ্যাসের খনি অনুসন্ধানে কয়টি সংস্থা তৎপর হয়ে উঠেছে। যাদের পরিকল্পিত অনুসন্ধান কার্যক্রমের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপন্ন না করার আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে।

খনিজ সম্পদ : পিট কয়লা

উপজেলা	তেরখাদা, রামপাল
মৌজা	কলা, গৌরাঙ্গ
সংরক্ষিত পীট	৮ মিলিয়ন টন
সম্ভাব্য খনিজ	সুন্দরবন এলাকায় তৈল, গ্যাস ক্ষেত্র

কৃষি সম্পদ

কৃষি জমি : জেলার মোট কৃষি জমির পরিমাণ ১,৪৯,৫১০ হেক্টর। এর মধ্যে ১০% জমিতে সেচ দেয়া হয়। ভূ-উপরিস্থিত পানির সাহায্যে সেচ দেয়া হয় ৫.৩% জমিতে এবং ৪.৯% জমি সেচের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল। এখানে শস্য নিবিড়তা (cropping intensity) ১২৪। খুলনায় প্রথম শ্রেণীর ০.০১ হেক্টর জমির চলতি বাজার মূল্য ১২,০০০ টাকা।

কৃষি জমি	১,৪৯,৫১০ হে.
সেচের জমি	১৫,২২৩ হে.
শস্য নিবিড়তা	১২৪

প্রধান ফসল : খুলনার অর্থনীতি কৃষিনির্ভর এবং তা অনেকাংশেই সুন্দরবন ও মংলা বন্দরের উপর নির্ভরশীল। জেলার মধ্যবর্তী এলাকা নানা ধরনের ফসল চাষের উপযোগী। ধান, পাট, সুপারি ও সবজি জেলার প্রধান ফসল। জেলার অধিকাংশ কৃষক স্থানীয় ও উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান, গম, সবজি, মসলা ও ডাল চাষ করে থাকে। এ ছাড়া কলা, নারিকেল, সুপারি, পেয়ারা ইত্যাদি ব্যাপক উৎপাদন দেখা যায়। ধান, চিংড়ি, পাট, সুপারি, গুড়, আম, কাঁঠাল জেলার প্রধান রফতানি ফসল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (১৯৯৬) হিসেব অনুযায়ী জেলার মোট ২৪% জমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ করা হয়। এলাকার জমি ব্যবহারের পরিকল্পনা না থাকায় বহু জমিই অব্যবহৃত, অতি ব্যবহৃত বা ভুল ব্যবহার হচ্ছে। ফলে কৃষকের অর্থ ও শ্রম - এই দু'য়েরই ক্ষতি হচ্ছে।

প্রধান অর্থকরী ফসল	ধান, চিংড়ি
প্রধান ফসল	ধান, পাট, সুপারি ও সবজি
রপ্তানী ফসল ও দ্রব্য	ধান, চিংড়ি, পাট, সুপারি, গুড়, আম, কাঁঠাল

মৎস্য সম্পদ : কৃষি ক্ষেত্রে জেলার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মাছের প্রাচুর্য। নদী, মোহনা, খাল-বিল, খাঁড়ি থেকে ধান চাষের সময় এবং বর্ষাকালে প্রচুর মাছ ধরা হয়।

২০০১-২০০২ সালে জেলায় মোট ২২,১৯০ মে.টন মাছ ধরা হয় এবং তা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চল (২,৫১,৯৯৯ মে.টন) এবং বাংলাদেশ (৬,৮৫,০৮০ মে.টন) এর পরিমাণের তুলনায় যথাক্রমে ৯% এবং ৩%। উল্লেখ্য, বিল এলাকা থেকে বিগত ২০০১-২০০২ সালে ১১৬ মে.টন মাছ ধরা হয় (মৎস্য অধিদফতর, ২০০৩)। সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যে কেবলমাত্র খুলনা জেলায়ই একযোগে নদী-মোহনা, সুন্দরবন, বিল, বন্যাপ্লাবন ভূমি ও বাঁওড় এলাকায় এই মাছ ধরা হয়।

জলাভূমি	মে.টন
নদী-মোহনা	২৬৩
সুন্দরবন	১২,৩৪৫
বিল	১১৬
বন্যাপ্লাবন ভূমি	৯,২৫৩
বাওড়	২১৩
মোট	২২,১৯০

চিংড়ি : খুলনা দেশের অন্যতম চিংড়ি উৎপাদনকারী জেলা। চিংড়ি চাষের তথ্য বিশ্লেষণে জানা যায় যে, ষাটের দশকের শেষে খুলনা-সাতক্ষীরার কিছু অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার কারণে ফসল উৎপাদন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এখানে মাছের স্থানীয় চাহিদা মেটাতে বিকল্প মাছ চাষ পদ্ধতিতে ঘের তৈরি করে মাছ চাষ শুরু করা হয়। সে সময় কেবলমাত্র ভেটকী, পারশে ও টেংরা মাছই চাষ করা হতো। পরে এ সব ঘেরে চিংড়ি চাষ শুরু হয়। সত্তরের দশকে আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে চিংড়ি একটি লাভজনক উৎপাদন হিসেবে চিহ্নিত হয়। এরপরে আশির দশকে আর্ন্তজাতিক বাজারে

চিংড়ি চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় চিংড়ি চাষ অর্থনৈতিক গুরুত্ব লাভ করে। ফলে দেশের উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষত দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে চিংড়ি চাষ ব্যপ্তি লাভ করে।

মৎস্য অধিদফতরের (২০০৩) হিসেব অনুযায়ী গত ২০০০-২০০১ সালে জেলায় মোট ২৯,৫৫১ হে. চিংড়ি ঘের (গলদা ও বাগদা) থেকে মোট ১৩,৮৮৯ মে.টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়। উল্লেখ্য, বিগত ১৯৯৬-৯৭ সালে চিংড়ি চাষের জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮,৬১৯ হে. এবং তা থেকে প্রায় ১১,৪৬০ মে.টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়। এই হিসেবে দেখা যায় যে, খুলনা জেলায় চিংড়ি চাষের জমি বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ ততটা বাড়েনি। মাঠ পর্যায়ের গবেষণা (২০০২), বিপদাপন্নতা স্টাডি (২০০৩) এবং পেশাজীবীদের সাথে মতবিনিময় সভা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জেলায় চিংড়ি ঘেরের জমি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও চাষীদের অজ্ঞতা, প্রশিক্ষণের অভাব, বিনিয়োগের অভাব, অপর্যাপ্ত চিংড়ি পোনা পরিচর্যা ইত্যাদি কারণে চিংড়ি উৎপাদন অপরিবর্তিত রয়ে যাচ্ছে।

সাল	চিংড়ি ঘের (গলদা ও বাগদা)	উৎপাদন
১৯৯৬-৯৭	২৮,৬১৯ হে.	১১,৪৬০ মে.টন
২০০০-০১	২৯,৫৫১ হে.	১৩,৮৮৯ মে.টন

বর্তমানে খুলনায় চিংড়ি চাষ ও ধানক্ষেতে মাছ চাষ দুটোই ব্যাপকভাবে প্রচলিত। চিংড়ি ঘেরের আইলে সবজি চাষের প্রচলন শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য চিংড়ি চাষের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে খুলনায় একটি আঞ্চলিক স্টেশন স্থাপিত হয়েছে।

পশু সম্পদ : কৃষি শুমারি ১৯৯৬ অনুসারে খুলনা জেলার গ্রামীণ এলাকায় মোট ৯২,৬৩৬টি গৃহের গবাদিপশু রয়েছে, যা মোট গ্রামীণ গৃহস্থালির ৪৪% এবং গৃহস্থালিগুলোর মোট গবাদিপশুর সংখ্যা মোট ৩,০৫,৭১৪। অর্থাৎ, প্রতিটি ঘরে গড়ে ৩.৩টি করে গবাদিপশু আছে। এ ছাড়া গ্রামীণ গৃহস্থের মোট হাঁস-মুরগির সংখ্যা ১২,৩০,০৫৫ এবং ঘরপ্রতি গড়ে ৫.৯টি করে হাঁস-মুরগি আছে। এ ছাড়া জেলায় মোট ৪৯৮টি পশুসম্পদ খামার এবং ৪৪৭টি হাঁস-মুরগি খামার রয়েছে।

মোট গবাদিপশু র সংখ্যা	৩,০৫,৭১৪টি
ঘর প্রতি গবাদিপশু (গড়)	৩.৩টি
মোট হাঁস-মুরগি র সংখ্যা	১২,৩০,০৫৫টি
ঘর প্রতি হাঁস-মুরগি (গড়)	৫.৯টি

দুর্যোগ

খুলনা জেলা প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। জলাবদ্ধতা, পানি-মাটির লবণাক্ততা, সাইক্লোন-জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ও পলি অবক্ষেপণ জেলার প্রধান কয়টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ ছাড়াও মানুষের কাজকর্ম, অসচেতনতা, দারিদ্র্য ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যা/দুর্যোগ তো রয়েছেই।

জলাবদ্ধতা : জেলার নগর ও গ্রামাঞ্চলের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হল জলাবদ্ধতা। পুরো জেলাই আজ আঞ্চলিক ও স্থানীয় এই দুই ধরনের জলাবদ্ধতার শিকার। নদী-নালা-খাল-বিল পলিতে ভরাট হয়ে যাওয়া, নদীর ভাটিতে সঞ্চিত পানির পরিমাণ কমে যাওয়া, অপরিকল্পিত বসতি স্থাপন, কৃষি জমির অভাব, রেল-সড়ক-মহাসড়ক, পোল্ডার নির্মাণ, অপরিকল্পিত পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও অবকাঠামো দুর্বল নিষ্কাশন ব্যবস্থা শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে জলাবদ্ধতার সংকট বাড়িয়ে চলছে। এ ছাড়া গ্রামাঞ্চলে অপরিকল্পিত মাছের ঘের, নদী-খালে আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণ, কচুরিপানা, পুকুর-খাল মজে যাওয়া, নদী-শাখা নদীতে স্থানীয় প্রভাবশালীদের অলিখিতভাবে ইজারা নিয়ে ভোগদখল ইত্যাদির কারণে জলাবদ্ধতার সমস্যা স্থায়ী রূপ নিচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার কথা বলা যায় - যেখানে সদরসহ সমগ্র এলাকায় জলাবদ্ধতা প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা, অপরিকল্পিত মাছের ঘের ও আড়াআড়ি বাঁধ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বা যথাযথ পানি ব্যবস্থাপনার অভাবের ফলে জলাবদ্ধতা দীর্ঘস্থায়ী সমস্যায় পরিণত হয়েছে। বিলের কাছাকাছি গ্রামগুলোর অবস্থা আরো করুণ। বিগত ২০০৩-২০০৪ সালের প্রবল বর্ষণের ফলে ডুমুরিয়া উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন, যেমন, ডুমুরিয়া সদর, খর্ডুয়া, রুদাঘরা, রংপুর, আটঘরিয়া, রঘুনাথপুর, ধামালিয়া, সাহস ও মাগুরঘোনার ৪৫টি গ্রামে স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ, বিশুদ্ধ পানির অভাব ও গো-খাদ্যের সংকটসহ পানিবাহিত রোগ যেমন, আমাশয় ও ডায়রিয়া ও পশুরোগের (বদলা ও তড়কা) প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এ ছাড়া প্রায় ৫০০ একর বীজ তলায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং প্রায় ১,০০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়। উল্লেখ্য, প্রতি বছর মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রবল বর্ষণে জলাবদ্ধতার সংকট তীব্র হয়ে উঠে। নিষ্কাশন খালে অবৈধ ইজারা এবং কাঁচা পাকা ড্রেনগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের কারণে সামান্য বৃষ্টিতেই খুলনা নগরী জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

জমি ডেবে যাওয়া : খুলনা জেলায় জমি ডেবে যাচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশংকা রয়েছে।। মূলত ১৯২৭ সাল থেকে বিল ডাকাতিয়া এলাকায় জমি ডেবে যাওয়ার (Earth subsidence) প্রমাণ মেলে। সে সময় ১.৫-২.৫ সেমি./বছর হারে জমি ডেবে যেত। তবে পোল্ডার তৈরির আগে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া জোয়ার-ভাটার সমতল নদী প্লাবন ভূমিতে পলি সঞ্চায়নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হতো। কিন্তু বর্তমানে, জোয়ার-ভাটার নদীর বুকে অব্যাহত পলি সমন্বয়ের ফলে নদীর তলদেশ নদীর পার্শ্ববর্তী জমির তুলনায় ক্রমশ উঁচু হয়ে যাচ্ছে এবং আশপাশের জমি তলিয়ে যাচ্ছে। জমি ডেবে যাওয়ার ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে জলাবদ্ধতা দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিচ্ছে।

মাটি ও পানির লবণাক্ততা : মাটি ও পানির লবণাক্ততা খুলনা জেলার একটি অন্যতম দুর্যোগ। উজানে গড়াই নদীতে শুকনো মৌসুমে পানির প্রবাহ কমে যাবার ফলে খুলনার ভূ-উপরিস্থিত পানি ও মাটিতে লবণাক্ততা বেড়ে যায়, যা স্বাভাবিক কৃষিব্যবস্থা ও শিল্পে বিশুদ্ধ পানির ব্যবহারকে অনিশ্চিত করে তুলে। এতে একদিকে যেমন ফসলের ক্ষতি হচ্ছে, অন্যদিকে জমির সার্বিক উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। চিংড়ি ঘেরের জমি লবণাক্ত হয়ে পড়ছে। শুধু তাই নয়, নালার সাহায্যে চিংড়ি ঘেরে লোনা পানির প্রবেশ ঘটানোর ফলে আশপাশের ধান ক্ষেতের জমি লবণাক্ততায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। এ ছাড়া সুন্দরবন এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানিও লোনায় আক্রান্ত হওয়ায় নিরাপদ পানির অভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কয়রা, ডুমুরিয়া, দাকোপ, পাইকগাছাসহ ডুমুরিয়া উপজেলার হাজার হাজার মানুষ এই সংকটে ভুগছেন। বিশুদ্ধ পানির অভাব এই জেলার একটি আঞ্চলিক সমস্যা।

গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তন, মাথাভাঙ্গা নদীর মুখ ভরাট হওয়া, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি আঞ্চলিক কারণ ও অপরিকল্পিতভাবে বাগদা চাষ ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের অভাব, আর্সেনিক দূষণ, ভূমির নিম্নগমন প্রভৃতি স্থানীয় কারণে জেলার নিরাপদ পানির সংকট ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করছে। এ ছাড়া পানিতে লবণ ও আয়রণের অতিরিক্ত পরিমাণ এই সংকটকে বাড়িয়ে তুলছে। আর তাই, এসব এলাকায় পুকুর অথবা বৃষ্টির পানিই

প্রধান ভরসা। শুকনো মৌসুমে পানির অভাবে এখানকার মানুষ লবণাক্ত ও আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করে। ফলে চর্মরোগ, পেটের পীড়া, আমাশয়, ডায়রিয়া, প্রজনন স্বাস্থ্যগত সমস্যার শিকার এই এলাকার মানুষ।

নদী ভরাট : অপরিকল্পিত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও নদী শাসন ব্যবস্থা এবং জটিল পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কারণে জেলার নদ-নদীগুলোতে পলির অবক্ষেপণ বাড়ছে। আর তাই পলি পড়ে অকালে নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে জেলার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা দিন দিন ভয়াবহরূপ ধারণ করছে। সৃষ্টি হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী লবণাক্ততা, নদীগুলো তাদের নাব্যতা হারিয়ে অনুকূল প্রাকৃতিক প্রতিবেশ ও ভারসাম্য নষ্ট করছে এবং শহর, গ্রাম, জনপদের মানুষকে বিপদাপন্ন করে তুলছে। দাকোপের পশ্চিমে ভদ্রা নদীর উপরে নির্মিত শৈলমারী গেটের কারণে নদীগুলোর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। কেননা এর মূল প্রবাহ ঝপঝপিয়া নদী দিয়ে পশুর-এ পড়ার পথে একটি উপ-নদীতে পরিণত হতে শুরু করেছে। ডুমুরিয়া সদর, রংপুর, খুর্ড়য়া, থুকড়ার হামকুড়া নদী প্রায় ১০টি শাখা নদী ও খালসহ পলিতে ভরাট হয়ে গেছে। এ ছাড়া উপজেলার পোল্ডার ১৭/১, ১৭/২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭/১, ২৭/২, ২৮/১ ও ২৯-এর প্রায় ৩০টি স্লুইস গেটে পলি পড়ে অকেজো হয়ে আছে। আর তাই থুকড়া-হামকুড়া নদীর বালিয়াখালী নামক স্থানে খুলনা সাতক্ষীরা মহাসড়কের ব্রিজটি আজ কেবল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এর নিচে এখন ধান চাষের জমিসহ ঘরবাড়ি চোখে পড়ে। অথচ এই নদীপথেই ৮০'র দশকে ফেরি পারাপার হতো।

নদী ভাঙন : জেলার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দুর্যোগ নদী ভাঙন। জেলার নদীগুলো আজ দ্রুত ও ধীরগতির ভাঙনের শিকার। ভৈরব নদী ভয়াবহভাবে ভাঙছে। প্রায় ৯ কি.মি. এলাকা দ্রুত ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে। ১৯৮০ সালে খুলনা নৌপথে রিভেটমেন্ট নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। এর ফলে ১৯৮৩-৮৪ সালে যে হার্ড পয়েন্ট ও রিভেটমেন্ট দেয়া হয় তা ধসে গেলে ১৯৯২-৯৩ সালে পুনরায় রিভেটমেন্ট প্রতিরক্ষা দেয়া হয়। কিন্তু, তা সত্ত্বেও ভৈরবের ভাঙন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে ভদ্রার ধীরগতির সাধারণ ভাঙনের প্রভাবও ব্যাপক। সমগ্র ডুমুরিয়া উপজেলা বিশেষত ডুমুরিয়া বাজার এলাকা ভয়াবহ ভাঙনের শিকার।

ভরা জোয়ার : সুন্দরবন এলাকা সব সময়ই ভরা জোয়ারের পানিতে ডুবে যায়। বর্ষায় নদীর পানির প্রবাহ বেড়ে সাগরের পানির উচ্চতা বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে ভরা জোয়ারের লোনা পানিতে সুন্দরবনের উপকূলসহ জনপদ প্লাবিত হয়। শুধু তাই নয়, নদী তীরবর্তী এলাকাগুলোতে ভরা জোয়ারের প্রভাব অপরিসীম। কপোতাক্ষ নদের তীরবর্তী কয়রা উপজেলায় জোয়ারের পানি থেকে সৃষ্ট স্থায়ী জলাবদ্ধতা বন্যায় রূপ নিচ্ছে, যা থেকে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের আশংকা করা হচ্ছে এবং অচিরেই একে দুর্গত এলাকা হিসেবে ঘোষণার দাবি উঠেছে। উল্লেখ্য, কপোতাক্ষ নদের জোয়ারের পানিতে কয়রা উপজেলার ক'টি গ্রাম ব্যাপকভাবে প্লাবিত হয়। এই নদীর পানির চাপে ভেঙ্গে যাওয়া ৮০০ মিটার রিং বাঁধের বিভিন্ন স্থান দিয়ে পানি উপচে গ্রামীণ জনপদ প্লাবিত করছে।

বন্যা : প্রবল বর্ষণ আর নিষ্কাশন জটিলতার কারণে খুলনায় বন্যার প্রকোপ দেখা যায়। জেলার পূর্বের নিম্নাঞ্চল জলমগ্ন হয়ে থাকার ফলে বন্যার প্রকোপ বেশি। তবে আগের তুলনায় খুলনায় বন্যার তীব্রতা অনেক কমেছে। জেলার নদ-নদীর পানি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলে তা দু'কূল ছাপিয়ে বন্যার রূপ নেয়। উল্লেখ্য, প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট বন্যার মধ্যে অন্যতম হল ১৯৭৮, ১৯৮১ ও ১৯৮৭-৮৮ সালের বন্য। ১৯৮৭-৮৮ সালে পর পর দু'বার বন্যার কবলে ফুলতলা ও তেরখাদা উপজেলার ব্যাপক ক্ষতি হয়।

কালবৈশাখী/টর্নেডো : প্রতি বছর মার্চের শেষ থেকে জুন-জুলাই পর্যন্ত এই জেলায় কালবৈশাখী/ টর্নেডো ছোবলের আশংকা থাকে। ক্ষণস্থায়ী এই টর্নেডো জেলার সম্পদ ও জনপদে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। উদাহরণ হিসেবে ২০০৪ মে মাসে ঘটে যাওয়া টর্নেডোর কথাই উল্লেখ করা যায়। মাত্র ৪ মিনিট স্থায়ী এই টর্নেডোর কবলে কয়রা উপজেলার মোট ছয়টি ইউনিয়নের ব্যাপক ক্ষতি হয়। প্রায় ১০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস, ২০০টি চিংড়ি ঘের, কপোতাক্ষের তীরে ১০০টি মাছ ধরার নৌকা, ৬,০০০ কাঁচা ও টিনশেডের বাড়ি, ৪টি ইউনিয়ন পরিষদ বিল্ডিং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে শতাধিক মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে এবং প্রায় ১,০০০ একর জমির

বোরো ফসল নষ্ট হয়। এ ছাড়াও বহু আম-কাঁঠালের গাছ উপড়ে পড়ে। উত্তর ও দক্ষিণ বেতকাশী, মদিনাবাদ, ঘুঘরোকাঠি এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়া পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সূত্র মতে, বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে ও ৭টি ট্রান্সফরমার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পুরো উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে।

সাইক্লোন : খুলনা জেলা বঙ্গোপসাগরের কাছে অবস্থিত হওয়ায় এখানে দুই ধরনের ঝড়ের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। সামুদ্রিক ঝড়ো-বাতাসের অতিরিক্ত আর্দ্রতার ফলে সৃষ্ট ঝড় এবং গভীর সাগরের নিম্নচাপের ফলে সৃষ্ট সাইক্লোন। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মোট ১৫টি বড় ধরনের সাইক্লোন সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলসহ খুলনায় আঘাত হানে। যদিও এই জেলা ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকা থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত। তবু প্রতিটি ঘূর্ণিঝড়ের কবলে জেলার জনপদ, ফসল, গাছপালা, গবাদিপশুর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এ ছাড়া প্রাণহানির ঘটনাতো রয়েছেই। উল্লেখ্য, ১৯০৯ সালে খুলনা বিভাগের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড়ের কবলে মোট ৬৯৪ জনের প্রাণহানি ঘটে (গেজেটিয়ার, ১৯৭৮)।

সাল	মাস	ক্ষতি	আক্রান্ত এলাকা
১৮৬৯	মে	ফসল, ঘরবাড়ি, গোলাঘরের ক্ষতি	নিম্নাঞ্চলের গ্রাম, মোরেলগঞ্জ
১৮৭৬	-	ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী কালে কলেরা মহামারী	সমগ্র খুলনা অঞ্চল
১৮৯৫	অক্টোবর	সুপারি ও রবিশস্যের ক্ষতি ও লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ	খুলনা-বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা উপ-সদর
১৯০৯	অক্টোবর	ফসল, সম্পদ, পশুসম্পদ ও ৬৯৮ জনের প্রাণহানি	সমগ্র খুলনা এলাকা ও প্রধান নদী
১৯১৯	সেপ্টেম্বর	সম্পদ, পশুসম্পদ ও জীবনহানি মৃতের সংখ্যা ৪৩২	খুলনা এলাকা
১৯৬১	মে	মানব ও পশুসম্পদের	খুলনা সদর ও বাগেরহাট
১৯৬৫	মে	ফসলি জমি ও পশুসম্পদের ক্ষতি	খুলনা
১৯৬৬	অক্টোবর	-	-
১৯৭০	নভেম্বর	-	বাগেরহাটের দক্ষিণাঞ্চল
১৯৮১	ডিসেম্বর	-	খুলনার চরাঞ্চল ও দ্বীপ
১৯৯৮	নভেম্বর	-	খুলনার চরাঞ্চল ও দ্বীপ

সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি : সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি সুন্দরবনের জন্য বিরাট হুমকি। মূলত সমগ্র বাংলাদেশই গাঙ্গেয় দ্বীপ হবার কারণে আজ এই হুমকির সম্মুখীন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, গ্রীন হাউজ গ্যাসের প্রভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে। যদি পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ৩০ সে. বাড়ে, তবে সমুদ্রের পানির উচ্চতা এক থেকে দেড় মিটার পর্যন্ত বাড়বে। ফলে দেশের উপকূল এলাকাসহ সুন্দরবন ও নতুন করে সৃষ্টি করা ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংস হয়ে যাবে। এই থেকে খুলনা জেলায় এর ভয়াবহ আশংকা সহজেই অনুমেয়।

জলবায়ুর পরিবর্তন : জলবায়ুর পরিবর্তন জেলার আরেকটি সমস্যা। দৈনিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি, আগাম বর্ষা বা অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, ও প্লাবনসহ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি - এ সবই জলবায়ুর পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টি না হবার কারণে খরিফ মৌসুমে খরার সৃষ্টি হয়।

পরিবেশ দূষণ : মানুষের অসচেতনতা-অজ্ঞতা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং শহরের অবকাঠামো জেলার সামগ্রিক পরিবেশ দূষণে প্রভাব ফেলছে।

রেডক্লিপ রোয়েদাদ : রেডক্লিপ রোয়েদাদের কারণে বর্তমানে অবিভাজ্য সুন্দরবনের কর্তৃত্ব বাংলাদেশ ও ভারতের উপর পড়েছে। সুন্দরবনের ভারতীয় অংশে পারমাণবিক কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই ও পরিকল্পনার বিষয়টি বর্তমানের একটি আলোচিত বিষয়। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, ভারত এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করলে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ভয়াবহ হুমকির মুখে পড়বে ।

জাহাজের বর্জ্য ও তেল নিঃসরণ : জাহাজের বর্জ্য ও তেল নিঃসরণ উপকূলীয় অঞ্চলের মাটি ও পানিকে দূষিত করছে। সমুদ্র উপকূলের বন্দর, নদী-বন্দর এবং জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের প্রভাবে সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চল আজ এই দূষণের শিকার। ১৯৯২ সালে খুলনা উপকূলে জাহাজ দুর্ঘটনায় সুন্দরবনের প্রায় ১৫ কি.মি. এলাকায় তেল নিঃসরণ

হয়। এটি তাৎক্ষণিকভাবে সুন্দরবনের ঘাস, ম্যানগ্রোভ চারাগাছ, মাছ, চিংড়ি ও জলজ প্রাণীর উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

আর্সেনিক দূষণ : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতি লিটার পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ মাত্রা ০.০১ মি. গ্রা.। কিন্তু বাংলাদেশে এর পরিমাণ ০.০৫ মি. গ্রা/লি:। খুলনা জেলায় পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ সহনীয় মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের (২০০১) তথ্যানুসারে জেলায় গভীর নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা ৩৫ মি.গ্রা./লি: এবং জেলার প্রায় ২৪% নলকূপে আর্সেনিকের মাত্রা ৫০ মি.গ্রা./লি. এর বেশি।

প্যারাবন উজাড় : জনমানুষের অজ্ঞতা, চোরাচালান, বনদস্যুদের দৌরাত্ম্য অতিমাত্রায় জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, বাগদা ঘের তৈরি ইত্যাদি কারণে বিশ্বের অন্যতম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন আজ উজাড় হবার পথে। বিগত ১৫০ বছরে সুন্দরবনের আয়তন ও জীববৈচিত্র্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আজকের সুন্দরবনের আয়তন ছিল দ্বিগুণ। উল্লেখ্য, বন উজাড়ের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ায় সামগ্রিক জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। এর নেপথ্যের কারণ হল অবৈধভাবে গাছ নিধন, কাঠ চুরি, ইটের ভাটায় কাঠ পোড়ানো, বন কেটে কৃষি জমি ও মাছের ঘের তৈরি ইত্যাদি।

জীব প্রজাতি হ্রাস : মানুষের কর্মকাণ্ড, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আবাস ভূমির অভাবে বহু জীব প্রজাতি আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এর মধ্যে এক প্রজাতির বুনো মহিষ, দুই প্রজাতির হরিণ, দুই প্রজাতির গণ্ডার, এক প্রজাতির কুমির অন্যতম। এ ছাড়া পানা হরিণ, নীলগাই, নেকড়ে গৌরবান্টিং, বুনো গরু, লালশির হাঁস, ময়ূর এবং মেছো কুমির আজ আর এই বনে দেখা যায় না। বন্যপ্রাণী নিধনের ফলে সুন্দরবনের জাতীয় প্রাণী রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও চিত্রা হরিণের সংখ্যা হ্রাস পাবে। আজ থেকে মাত্র ৫০ বছর আগেও সুন্দরবন কুমিরের স্বর্গরাজ্য হিসেবে বিবেচিত হতো। এক্ষেত্রে সুন্দরবনের ভৈরব, মধুমতি নদী ও মোহনায় ব্যাপক কুমির ছিল। কিন্তু, বর্তমানে কুমিরের সংখ্যা বিরল। বনবিভাগের কাছেও কুমিরের সঠিক গণনা নেই, যদিও তারা এই বিষয়ে সচেতন।

সুন্দরী গাছের আগামরা রোগ : পরিবেশ বিপর্যয়ের একটি অন্যতম উদাহরণ হল সুন্দরী গাছের আগামরা রোগ। সুন্দরবনের মোট ৪৩টি কম্পার্টমেন্টে এই রোগ অপ্রতিরোধ্যভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। উপযুক্ত পদক্ষেপ ও প্রতিষেধকের অভাবে স্থানীয় বিশেষজ্ঞরা রোগাক্রান্ত গাছ কেটে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, এই রোগের কারণ নির্ণয়ে ১৯৯৬-৯৭ সালে বনজসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় বনবিভাগ প্রথম গবেষণা চালায়। এরপরে ২০০১-২০০২ সালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় একটি গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী সুন্দরবনের মাটির অত্যধিক লবণাক্ততা, জিংক ও ম্যাঙ্গানিজের স্বল্পতা এবং ক্যালসিয়ামের অতিরিক্ত পরিমাণ সর্বোপরি লরেনথাস/ বা এক ধরনের পরজীবী এই রোগের অন্যতম কারণ। উল্লেখ্য, সুন্দরবনে আগামরা রোগের আশংকাজনক বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে আগামী দুই-তিনশ বছর পরে এর অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে যাবে। কেননা বঙ্গোপসাগরের কোলঘেঁষা প্রাকৃতিক এই বনের প্রায় ৭৩ শতাংশ সুন্দরী গাছ। এই সুন্দরী গাছের নামেই সুন্দরবন নামকরণ করা হয়। বিগত দুই দশকের তথ্য বিশ্লেষণে আগামরা রোগের দ্রুত বিস্তারের চিত্রটি সহজেই চোখে পড়ে।

সাল	কম্পার্টমেন্ট সংখ্যা
১৯৮৫	১৪
১৯৯৫	২৭
২০০২	৩৫
২০০৪	৪৩

মাছের প্রজাতি হ্রাস : সুন্দরবনের জলাভূমি ও মোহনায় মাছের প্রাচুর্য আজ অনেকাংশেই কমে গেছে। অতিরিক্ত পরিমাণে চিংড়ি পোনা আহরণ মাছের প্রজাতির হ্রাসের একটি প্রধান কারণ। এ ছাড়া অপরিকল্পিত নদী শাসনের ফলে নদী-নালা-খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় সাদা মাছের বহু প্রজাতিই আজ বিলুপ্ত হবার পথে। উদাহরণস্বরূপ পাতারি মাছের কথা বলা যায়। আগে জেলার নিম্নাঞ্চলে ও জলাভূমিতে এই মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এখন কচুরিপানা, মাছের ঘের, ফসলের মাঠ আর নগরায়নের বিস্তৃতিতে সে সব আজ অতীতের স্মৃতি। শুধু তাই নয়, খুলনার সর্বত্রই আজ চিংড়ি চাষকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মাস্তানি, খুন অতিপরিচিত একটি ঘটনা। ২০০২ সালের মৎস্য আইনে চিংড়ি পোনা ধরা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও এর বাস্তব প্রয়োগ নেই।

বাঘের আক্রমণ : খুলনা ও সাতক্ষীরা রেঞ্জ এলাকায় বাঘের বিচরণ তুলনামূলকভাবে বেশি। সুন্দরবন বিভাগের এক জরিপ অনুযায়ী প্রতিবছর গড়ে ২৫ জন মানুষ বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারায়।

সুন্দরবনে মধু উৎপাদন হ্রাস : সুন্দরবনের বুড়ি গোয়ালিনী রেঞ্জ থেকে সুন্দরবনের তিনভাগের দুই ভাগ মধু পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, খোলসে ও গেওয়া গাছ থেকে সর্বোৎকৃষ্ট মধু পাওয়া যায়, যা 'পদ্মমধু' নামে পরিচিত। সাম্প্রতিককালে সুন্দরবনে মধু উৎপাদন আশংকাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। অপরিকল্পিত এবং অবৈধ উপায়ে মধু আহরণ এর প্রধান কারণ। ক্রমাগত বন উজাড়ের ফলে মৌমাছিরা সুন্দরবনে আর আগের মত মৌচাক বানাতে পারে না।

বিপদাপন্নতা

বিপদাপন্নতা বলতে মানুষের জীবনে বিভিন্ন নেতিবাচক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এবং সেই নেতিবাচক ঘটনার সাথে মানুষের অভিযোজনের ক্ষমতাকে বুঝায়। বিপদাপন্নতার ধরণ, প্রকার ও ব্যপ্তিতে ভিন্নতা আছে। সব রকম বিপদাপন্নতা দ্বারা জেলার সব এলাকার পেশাজীবী ও সাধারণ মানুষ সমানভাবে আক্রান্ত হয় না। উপকূলীয় অঞ্চলের প্রধান জীবিকা দল ক্ষুদ্র কৃষক, জেলে, গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিকদের উপর পরিচালিত এক বিপদাপন্নতা সমীক্ষা (সিইজিআইএস, ২০০৪)-য় দেখা গেছে, খুলনা জেলার ক্ষুদ্র কৃষকদের জীবন ও জীবিকায় কৃষি জমির অভাব, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, জমি বন্দোবস্ত ও দুর্বল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্যতম প্রধান বিপদাপন্নতা । অন্যদিকে জেলেদের জীবনের প্রধান বিপদাপন্নতা হল সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, মাছের প্রজাতি হ্রাস, নদী ভরাট, জলাবদ্ধতা ও জলদস্যুদের আক্রমণ। গ্রামীণ মজুরি শ্রমিকদের জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যাই প্রকট। দীর্ঘস্থায়ী কাজের অভাব ও স্বল্প/নিম্ন মজুরি তাদের জীবনকে বিপদাপন্ন করে তোলে। সামাজিক নিরাপত্তহীনতা, কাজের অভাব, গৃহায়ন সমস্যা ও আইন-শৃঙ্খলার অভাবে শহুরে শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, ক্ষুদ্র কৃষক ও জেলেরা প্রাকৃতিক বিপদাপন্নতা র শিকার। অন্যদিকে গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিকরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপদাপন্ন।

জীবিকা দল	বিপদাপন্নতা
জেলে	সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, মাছের প্রজাতি হ্রাস, নদী ভরাট, জলাবদ্ধতা ও জলদস্যু
ক্ষুদ্র কৃষক	কৃষি জমির অভাব, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, জমি বন্দোবস্ত ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি
গ্রামীণ মজুরি শ্রমিক	কাজের অভাব ও স্বল্প/নিম্ন মজুরি
শহুরে শ্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, কাজের অভাব, গৃহায়ন সমস্যা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

জীবন ও জীবিকা

জনসংখ্যা

খুলনার মোট জনসংখ্যা ১৭.৫৯ লাখ, যার মধ্যে ৯.১৫ লাখ পুরুষ এবং ৮.৪৪ লাখ নারী (বি.বি.এস., ২০০১)। জেলার লিঙ্গ অনুপাত ১০০: ১০৯.৯। মোট জনসংখ্যার ৮৭% গ্রামে বাস করে। খুলনা ততটা ঘনবসতিপূর্ণ নয়। প্রতি বর্গ কি.মি. ৫৩৭ জন লোক বাস করে, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ৭৪৩ জন/ বর্গ কি.মি.।

০-১৪ ও ৬০$^{+}$ বছর বয়সী জনগণ ও ১৫-৫৯ বছর বয়সী জনগণের মধ্যে নির্ভরশীলতার অনুপাত ০.৬৯:১০০, (বি.বি.এস., ২০০১)। এই জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার ৫৯ এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ৯০ (বি.বি.এস., ইউনিসেফ, ২০০১)।

শহুরে জনগণ (লাখ)	১২.৫৬
পুরুষ	৬.৬
নারী	৫.৮
গ্রামীণ জনগণ (লাখ)	১১.০১
পুরুষ	৫.৬৭
নারী	৫.৩৪
লিঙ্গ অনুপাত	১০০: ১০৯.৯
নির্ভরশীল জনগণের অনুপাত	০.৬৯:১০০
জনসংখ্যার ঘনত্ব (বর্গ কি.মি.)	৫৩৭
ঘনত্বের ক্রম (৬৪টি জেলার মধ্যে)	৫২
নবজাতক মৃত্যুর হার	৫৯
<৫ মৃত্যুর হার	৯০

নৃ-গোষ্ঠী : নৃ-তত্ত্বগতভাবে খুলনা জেলার প্রকৃত অধিবাসীরা ছিল অনার্য, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় বর্ণের সংমিশ্রণের জনগোষ্ঠী। এই প্রসঙ্গে W.W. Hunter ১৮৭৫ সালে উল্লেখ করেন, "জেলার অধিবাসীরা মূলত বাঙালি এবং কেউ কেউ নিজেদের শিকারী বা শিকারী গোত্রভুক্ত বলেন, যারা কিনা খুব কম কৃষিকাজে জড়িত ছিল"। জেলার প্রধান নৃ-গোষ্ঠী বলতে প্রধানত ভূমিজাজ, গারো, কোল, সাঁওতাল ও ঢাঙ্গরদের বুঝানো হতো।

খুলনা জেলার নগরায়নের ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইস্ট-ইন্ডিয়াকোম্পানি বা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ, শিল্প সম্ভাবনা এবং নগরায়নের প্রভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও সীমান্তবর্তী দেশ থেকে খুলনায় বহিরাগতদের আগমন ঘটতে শুরু করে। উপনিবেশবাদী শোষণ ও জীবিকার তাগিদে এদের অনেকেই স্বজাতি পরিচয় হারাতে শুরু করে। জেলার বনুয়া বা বুনো, মাড়োয়ারি ও বিহারী সম্প্রদায় তার-ই কয়টি উদাহরণ। এরা জেলার শিল্প-বাণিজ্য, অর্থনীতির বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে এবং বর্তমানে এদের সংখ্যা অনেক কম।

বুনাই বা বুনো সম্প্রদায় : ১৭৯৫ সালে খুলনা-যশোর এলাকায় ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি নীলকুঠি স্থাপন শুরু করে। রাইয়তী পদ্ধতি বা স্থানীয় মজুরদের দিয়ে নীল চাষের লক্ষ্যে নীলকরেরা ভারতের মেদিনীপুর থেকে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু কুলি এবং বাঁকুড়া, বীরভূম, মালভূম ও সিংভূম অঞ্চল থেকে সাঁওতালদের নিয়ে আসত। সাঁওতালদের দৈহিক গঠন, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণ সর্বোপরি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে সমাজে বুনাই বা বুনো সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিতি পায়। জেলা শহরের মিউনিসিপ্যাল ট্যাংক রোড থেকে টিবি ক্রস রোড, সাউথ সেন্ট্রাল রোড থেকে খানজাহান আলী ও তার দক্ষিণে অয়েল মিল থেকে চানমারি পর্যন্ত এলাকা ও পি.টি.আই-এর দক্ষিণে মিয়া পাড়ায় বুনাইদের অবস্থান ছিল। বর্তমানে এদের সংখ্যা নগণ্য।

মাড়োয়ারি সম্প্রদায় : কৃষি পণ্যের উৎসভূমি হিসেবে পরিচিত খুলনার কাঁচামাল আহরণের লক্ষ্যে ভারতের বিকানী সীকার ও জয়পুর থেকে মাড়োয়ারিরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে খুলনায় ভিড় জমাতে শুরু করে। ১৮৮৪ সালে পূর্ববঙ্গ রেলপথ কলকাতা থেকে খুলনা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবার ফলে খুলনার ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ মাড়োয়ারিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। প্রধানত পাট, কাপড়, ধান, ও তেল-এর ব্যবসাই ছিল তাদের আয়ের প্রধান উৎস। উল্লেখ্য, খুলনায় এরাই প্রথম দৌলতপুর জুট মিল শিল্প কারখানা গড়ে তোলে। ভৈরব নদীর "মাড়োয়ারি ঘাট"-টি তারই স্মৃতি বহন করে চলেছে। এই হিন্দু মাড়োয়ারিদের উদ্যোগেই খুলনার বড় বাজারে "মাড়োয়ারি মন্দির" স্থাপিত হয়। এ ছাড়া খুলনা শহরের প্রেমকানন নামের উদ্যানটি এদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

বিহারী সম্প্রদায় : পাক-ভারত বিভাগের পর বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর থেকে বিপুলসংখ্যক অবাঙগালি বাংলায় আশ্রয় নেয়। খুলনার শিল্প কারখানা ও নগরায়নে আকৃষ্ট হয়ে এদের অনেকেই কল-কারখানায় ছোট-খাটো কাজ নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। বিহারীরা এখন পর্যন্ত খুলনায় কিছু চিরায়ত পেশা যেমন, বাবুর্চি, কসাই ইত্যাদিতে প্রভাব বিস্তার করে আছে।

ঘর-গৃহস্থালি : খুলনা জেলায় গৃহস্থালির ধরনে ভিন্নতা রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে ঘর গেরস্থালিতে গোলপাতার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। শহুরে (২.৭১ লাখ) ও গ্রামীণ (২.২২ লাখ) মিলিয়ে মোট গৃহস্থালির সংখ্যা ৪.৯৪ লাখ। প্রতিটি গৃহস্থ পরিবারে গড় জনসংখ্যা ৪.৮ জন। জীবিকার ধরনের উপর গৃহস্থালির ধরন নির্ভরশীল। ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারি অনুযায়ী জেলার মোট গ্রামীণ নারী প্রধান গৃহস্থালি রয়েছে ২.৮৫%।

ঘরের কাঠামোর বিবেচনায় ৬২% ঘরে পাকা দেয়াল এবং ৪৪% ঘরে পাকা ছাদ রয়েছে। জেলার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সমগ্র উপকূলীয় অবস্থার তুলনায় মোটামুটিভাবে উন্নত। ২০০১ সালের লোক গণনার প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ৪২% ঘরে বিদ্যুতের সংযোগ আছে।

মোট গৃহস্থালির সংখ্যা	৪.৮ লাখ
শহুরে	২.৭১ লাখ
গ্রামীণ	২.২২ লাখ
গৃহপ্রতি গড় জনসংখ্যা	৪.৮ জন
নারী প্রধান গৃহ (মোট গৃহস্থালির)	২.৮৫%

জনস্বাস্থ্য

জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খুলনা জেলায় ৪টি সরকারি হাসপাতাল, ৩৬টি বেসরকারি হাসপাতাল, ১০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ১৪টি গ্রামীণ ডিসপেন্সারি রয়েছে (বি.বি.এস., ১৯৯৬)। জেলা সদরের সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৮২০। মোট ২৮৭৭ জনের জন্য একটি হাসপাতাল (সরকারি ও বেসরকারি) শয্যা রয়েছে। জেলার জনগণের মধ্যে প্রধানত যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তা হল, সর্দি-জ্বর, ডায়রিয়া, আমাশয়, স্ক্যাবিস, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া ও পেপটিক আলসার ইত্যাদি।

শিশু স্বাস্থ্য : খুলনা জেলায় পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৯০ জন এবং ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ৩% শিশুই অপুষ্টির শিকার (বি.বি.এস. ইউনিসেফ, ২০০১)। এই পরিসংখ্যানে আরো দেখা গেছে যে, হাম, ডিপিটি ও পোলিও রোগের টিকা নিয়েছে যথাক্রমে ৮০%, ৭৫% ও ৮৪% শিশু। এ ছাড়া ৩২% শিশু ORT নিয়েছে। ৯১% গৃহে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করে।

৫ বছরের কম শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	৯০
১২-৫৯ মাস বয়সী শিশু অপুষ্টির হার	৩%
আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারকারী গৃহ	৯১%

পানি ও পয়ঃসুবিধা : খুলনার নগরায়নের ইতিহাসে জানা যায়, এক সময়ে শহরের মানুষ পানির জন্য পুকুরের উপর নির্ভরশীল ছিল। এর পরে ১৯২৯ সালে জেলায় দুটি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ করা হয়। একই সময়ে খাওয়ার

পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে ঐতিহ্যবাহী পানি কল বা ঢোপ কল স্থাপন করা হয়। এর পরবর্তীতে রিজার্ভ ট্যাংকে পানি উত্তোলন শুরু হয়। ১৯৩৪ সালে পানির ট্যাংকে বৈদ্যুতিক মোটর চালু হয়। মূলত পাকিস্তান আমলে জেলার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। এ সময়ই জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ আধুনিক ডিজাইনের ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ শুরু করে। ১৯৬০ সালের ২৩ শে অক্টোবর শহরে "পানি সরবরাহ প্রকল্প" চালু করা হয়। এর আওতায় শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় পানির রিজার্ভার স্থাপন করা হয়।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের আওতায় পানি সরবরাহ চালু আছে। জনসাধারণের জন্য পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে-ভূ-উপরিস্থিত পানির উপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে তা কেবলমাত্র বর্ষা মৌসুমে চালু থাকে। শুকনো মৌসুমে ভূ-উপরিস্থিত পানির লবণাক্ততার বৃদ্ধির হার জেলার জনসাধারণকে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল করে তোলে। নিরাপদ পানির জন্য জেলার মোট গৃহস্থালির ৮৭% কল অথবা নলকূপের পানি ব্যবহার করে। বাকি ১৩% পানির অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভরশীল। উল্লেখ্য, খুলনার ৮২% নলকূপেই আর্সেনিকের দূষণ পরীক্ষা করা হয়নি এবং মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫০% মানুষ আর্সেনিক বিষক্রিয়ার কথা শুনেছেন (বি.বি.এস.- ইউনিসেফ, ২০০১)। একই সূত্রানুসারে খুলনার নলকূপের প্রতি ১ লিটার পানিতে আর্সেনিকের গড় মাত্রা ৩৫ মাইক্রোগ্রাম যা সহনীয় মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের হিসেব অনুসারে (২০০২) খুলনা জেলার গ্রামীণ এলাকায় ১৪৮ জন লোকের জন্য একটি করে সক্রিয় টিউবওয়েল রয়েছে এবং প্রতি বর্গ কি.মি.-এ সক্রিয় টিউবওয়েলের সংখ্যা মোট ৪টি।

জেলায় মাত্র ৫৯% ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা এবং ৩৪% ঘরে কাঁচা পায়খানা রয়েছে। এ ছাড়া ৭% ঘরে কোনরকম কাঁচা বা পাকা পায়খানার সুবিধা নেই। শহর ও গ্রামের পয়ঃসুবিধা বিশ্লেষণে স্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে।

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাসহ গৃহ	৫৯%
অন্যান্য সুবিধাসহ গৃহ	৩৪%
পায়খানার সুবিধাবিহীন গৃহ	৭%
কল বা নলকূপের উপর নির্ভরশীল গৃহ	৬০%

শিক্ষা

জেলার জনসাধারণের সাক্ষরতার হার উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে চতুর্থ স্থানে। সাত বছর বয়সের ওপরে মোট জনসংখ্যার সাক্ষরতার হার প্রায় ৫৭% (বি.বি.এস., ২০০১)। অন্যদিকে, প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ ১৫ বছর বয়সী ও তার উর্ধ্বের জনসাধারণের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৬১%।

সাক্ষরতার হার (৭^{+})	৫৭%
প্রাপ্ত বয়স্কদের সাক্ষরতার হার (১৫^{+})	৬১%
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়	৮৯
মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়	২৭৫
কিন্ডারগার্টেন	৪৯
উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ	৫৮
মাদ্রাসা	১০৩
মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৮২
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮৯৫
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	৩৭১০৭৮
ভর্তির হার	৯৬
গড় বিদ্যালয় (প্রতি ১০ হাজার)	৯

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর (২০০৩)-এর তথ্য অনুযায়ী খুলনা জেলায় সর্বমোট ১,৯৮২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৮৯৫টি হল সরকারি। এই বিদ্যালয়গুলোতে মোট ৩,৭১,০৭৮ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি হবার হার ৯৬%। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার তুলনায় পর্যাপ্ত। জেলায় প্রতি ১০,০০০ জনগণের জন্য গড়ে ৯টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, যা জাতীয় গড় সংখ্যা (৬)-এর তুলনায় অনেক (প্রা.শি.অ., ২০০৩) বেশি। মোট শিক্ষক সংখ্যা ৫,৭০৭ জন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৬৫:১। এ ছাড়া বি.বি.এস., ১৯৯৮-এর তথ্য অনুযায়ী খুলনা জেলায় মোট ৪৯টি কিন্ডারগার্টেন রয়েছে।

জেলার ৮৯টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র, ছাত্রী ও শিক্ষক সংখ্যা যথাক্রমে ২১, ৯৯১ ও ৯৪৭ অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ২৩:১। আবার জেলার মোট ২৭৫টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১,২৮,৫০৮ জন। মোট শিক্ষক সংখ্যা ৪,৯৫৪ জন। অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ২৬:১। অন্যদিকে জেলার মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ১০৩টি। মোট ১৮,৭৯০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ১,৮৮৩ জন শিক্ষক এখানে কর্মরত আছেন। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১০:১, যা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় ভাল। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মোট ৫৮টি মহাবিদ্যালয় রয়েছে, যার মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৩৯,৬৪৮ জন এবং ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ২৪:১।

খুলনা জেলার ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতর ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। একই সাথে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (বিআইটি-খুলনা), খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যেমন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কারিগরি ইনস্টিটিউট ও সমাজকল্যাণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদির উপস্থিতি এর মূল কারণ।

অভিবাসন

খুলনা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান একটি জেলা যেখানে অন্যান্য জেলা থেকে বহু লোক এসে বসতি গড়ে তোলে। পাক-ভারত বিভক্তির সময়ে বহু লোক ভারত থেকে খুলনায় এসে আশ্রয় নেয়। তারা পরবর্তীতে জেলার বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। বেশিরভাগ লোক কাজ ও বাণিজ্যের আশায় এখানে চলে আসে। তবে তারা স্থায়ী অভিবাসী নয়। বর্তমানেও ঋতুগত ও চক্রীয় অভিবাসনের এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। মূলত বরিশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং উত্তরাঞ্চল যেমন, রংপুর, বগুড়া থেকে লোকজন অভিবাসিত হয়ে আসে। নগরায়ন ও শহুরে সাংস্কৃতির প্রভাবে অন্যান্য জেলা থেকে খুলনায় অভিগমনের প্রবণতা খুব বেশি। বি.বি.এস., ১৯৯১-এর সূত্রানুসারে জেলার মোট জনসংখ্যার (২০ লাখ ১০ হাজার) প্রায় ৩৩% জনগণ খুলনার বাইরে থেকে আগত।

সামাজিক উন্নয়ন

সাক্ষরতার হার (৭$^{+}$ বছর বয়সী), নিরাপদ পানি সুবিধা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয় এলাকার সামাজিক উন্নয়নকে নির্দেশ করে। বিভিন্ন তথ্য সূত্র থেকে পাওয়া সংখ্যা ও গণনার ভিত্তিতে বলা যায়, খুলনা জেলা সামগ্রিকভাবে সামাজিক উন্নয়নে মোটামুটিভাবে এগিয়ে আছে।

সাক্ষরতার হার (৭$^{+}$ বছর)	৫৭
নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত	৮৭
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	৫৯
হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা	২,৮৭৭

প্রধান জীবিকা দল

খুলনার প্রধান জীবিকা পর্যালোচনায় "খুলনা জেলা সেনসাস রিপোর্ট" (১৯৬১)-এর কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে বলা হয়েছে - "খুলনার জনসংখ্যার বিরাট অংশই কৃষিজীবী। এর পরেই রয়েছে জেলে। এ ছাড়া মোট জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। কৃষকদের সাথে তুলনায় বলা যায় জেলার কাঠুরিয়ারা অত্যন্ত দারিদ্র্য"। সুন্দরবন, জলাভূমি, মোহনার অফুরন্ত মাছ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ এই জেলার মানুষের জীবন ও জীবিকায় প্রভাব ফেলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, নদী ভাঙন, সাইক্লোন, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রম অবনতি, ভূমিহীনতা, দারিদ্র্য এবং জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি মানুষের জীবিকার ধরনে পরিবর্তন আনছে। চাষের জমির ক্রম বিভাজন একটি পরিবারকে কৃষি কাজের উপর আর নির্ভরশীল করে রাখতে পারছে না। তাই

জীবিকা দল	পরিবারের সংখ্যা
জেলে	৪২,০০০
ক্ষুদ্র কৃষক	১,০৫,৬২৬
মধ্যম কৃষক	৩৩,০৮৯
বড় কৃষক	৬,১১৫
কৃষি শ্রমিক	৮৩,৬৭১

আজ খুলনায় কৃষক থেকেও পেশার পরিবর্তন চিংড়ি চাষী ও কৃষি শ্রমিকে পরিণত হবার ধারা তৈরি হয়েছে। জেলার প্রধান জীবিকা দলগুলো হল, ক্ষুদ্র কৃষক, গ্রামীণ শ্রমিক (প্রধানত কৃষি শ্রমিক), শহুরে শ্রমিক ও জেলে। এ ছাড়াও চিংড়ি চাষসহ অন্যান্য কাজকর্ম করে খুলনার মানুষেরা সংসার চালায়।

জেলে : খুলনার উপকূলীয় এলাকা ও চরাঞ্চলে বিশাল জেলে সম্প্রদায়ের বসবাস। মোহনা, গভীর সমুদ্রে ট্রলার অথবা নৌকা নিয়ে এরা মাছ ধরে। এদের অনেকেই বংশানুক্রমিকভাবে জেলে এবং প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বী। আবার মুসলমানদের অনেকেই মাছ ধরার পেশায় নিয়োজিত। মোট জেলে পরিবারের সংখ্যা ৪২,০০০ টি, যা কৃষিজীবী পরিবারের ২৯%। এর মধ্যে ৪,০০০ টি বড় জেলে পরিবার, ২৩,০০০ টি ছোট জেলে পরিবার এবং ১৫,০০০ টি মাঝারি জেলে পরিবার রয়েছে (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

উল্লেখ্য, এক সময় চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে জেলেরা সুন্দরবনের আশপাশে অস্থায়ী বসতি গড়ে তুলে একনাগাড়ে কয়েক মাস ধরে নদী, মোহনার মুখ ও গহীন সমুদ্রে মাছ ধরত। সাধারণত পশুর ও ভাঙ্গা নদীর মুখে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত তারা মাছ ধরত। বর্তমানে সমুদ্রগামী জেলেদের জীবনে নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। জলদস্যুদের আক্রমণ, মাছ ধরার ট্রলার ছিনতাই, জীবননাশ - এ সবই আজকালকার জেলেদের জীবনে প্রায়ই ঘটছে। এ ছাড়া দাদন বা মহাজনী শোষণ তো রয়েছেই। তাই সুন্দরবন উপকূলে সেই রকম পেশাদার জেলেদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

কৃষক : খুলনা জেলার মোট ক্ষুদ্র কৃষিজীবী (যাদের মোট কৃষি জমির পরিমাণ ০.০৫ - ২.৪৯ একর) পরিবারের সংখ্যা ১,০৫,৬২৬টি, মধ্যম কৃষিজীবী (২.৫০ - ৭.৪৯ একর) পরিবারের সংখ্যা ৩৩,০৮৯টি এবং বড় কৃষক (৭.৫০+ একর) পরিবারের সংখ্যা মোট ৬,১১৫টি (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

কৃষি শ্রমিক : কৃষি জমি ক্রমাগত কমে যাচ্ছে এবং পরিবারের বিভাজনে মাথাপিছু জমির পরিমাণও ব্যাপকহারে কমে যাচ্ছে। ফলে কৃষক কৃষি শ্রমিকে রূপান্তরিত হচ্ছে। জেলায় মোট কৃষি শ্রমিক গৃহস্থালির সংখ্যা ৮৩৬৭১টি।

শহুরে শ্রমিক : জেলায় শহুরে শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। নগরায়ন, কাজের অভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের (সিইজিআইএস, ২০০৩) কারণে গ্রামের ভূমিহীন ও অন্যান্য জেলার মানুষ শহরে এসে ভিড় জমায়। জীবিকার তাগিদে এদের কেউ কেউ যোগালী, নির্মাণ শ্রমিক, মুটে, মজুর, তাঁত শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। জেলায় শহুরে নারী শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। উপযুক্ত কাজের অভাব ও অসচেতনতা এর মূল কারণ (আইসিজেডএমপি, ২০০২)। উল্লেখ্য, খুলনা জেলায় দিনমজুরির উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশ বাড়ছে। গ্রামাঞ্চলে ফসল কাটা ও ঘের তৈরির মৌসুমে পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে এবং গ্রামান্তরে অস্থায়ী অভিবাসন বেড়ে যায়। এ ছাড়া নগরায়নের ফলে শহর এলাকাতেও অসংখ্য লোক কাজের আশায় ভিড় জমায়। স্বল্প মজুরি, নিম্ন মজুরি, মজুরি শোষণ আজ তাই নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় দাঁড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেব অনুযায়ী ১৯৯১-৯২ সালে কৃষি শ্রমিকদের মজুরি ছিল মাত্র ৩১ টাকা, যা কিনা ১৯৯৭-৯৮-এ বেড়ে দাঁড়ায় মাত্র ৪৫ টাকা (বি.বি.এস., ২০০১)। যোগালীর মজুরির ক্ষেত্রেও একই চিত্র

	মজুরি (টাকা)	
মজুরি শ্রমিক	১৯৯১-৯২	১৯৯৭-৯৮
কৃষি	৩১	৪৫
যোগালী	৪৯	৫৭
কামার	৮১	১১৩

দেখা যায়। কেননা, ১৯৯১-৯২ সালে একজন যোগালীর মজুরি ছিল ৪৯ টাকা, যা ১৯৯৭-৯৮তে বেড়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫৭ টাকা। এই চিত্র মজুরি শোষণকে তুলে ধরে। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, কামারদের ক্ষেত্রে এটি আশাব্যঞ্জক (বি.বি.এস., ২০০১)।

চিংড়ি চাষী : জেলায় চিংড়ি চাষীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। আশপাশের চিংড়ি চাষীদের সফলতা দেখে বর্তমানে বহু কৃষকই তাদের চাষের জমিকে চিংড়ি ঘেরে রূপান্তর করছে। ফলে কৃষক হয়ে যাচ্ছে চিংড়ি চাষী।

এ ছাড়া এই জেলায় আছে অসংখ্য বাওয়ালী, মৌয়ালী ও চিংড়ি পোনা সংগ্রহকারীদের বসবাস। জীবিকার তাগিদে খুলনার মোট গৃহস্থালির ২৭% সুন্দরবনের সম্পদ আহরণের উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে ৩৫% চিংড়ি পোনা সংগ্রহকারী, ৩৩% জেলে, ২২% বাওয়ালী, ৪% নৌকার মাঝি, ৩% গোলপাতা সংগ্রহকারী, ২% শামুক-কাঁকড়া সংগ্রহকারী ও বাকি সব মৌয়ালী। উল্লেখ্য, সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে জীবিকার তাগিদে প্রায় ২ লাখ নারী-পুরুষ চিংড়ি পোনা ধরার কাজে নিয়োজিত। সুন্দরবন উপকূলের মানুষেরা নিজেদের অজান্তে সাগরের মাছের প্রজাতি ধ্বংস করছে। অতি সম্প্রতি সন্ধানী লাইফ ইনসুরেন্স সুন্দরবনে পাসধারী বাওয়ালী ও মৌয়ালীদের জীবন বীমা কার্যক্রম চালু করেছে। এই বীমা সুবিধা অনুযায়ী, বন বিভাগের অনুমতিক্রমে বাওয়ালী এবং মৌয়ালীরা কাঠ, মধু ও অন্যান্য সম্পদ আহরণের জন্য সুন্দরবনে প্রবেশ করে যে কোন কারণে মৃত্যু হলে তার পরিবার এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা বীমা সুবিধা পাবে। এজন্য তাদের জনপ্রতি বার্ষিক ১০০ টাকা হারে বীমা কোম্পানিকে প্রিমিয়াম প্রদান করতে হবে। ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সী বাওয়ালী ও মৌয়ালীরা এই বীমা সুবিধার আওতাভুক্ত।

অর্থনৈতিক অবস্থা

১৯০৮ সালে L.S.O. Malley খুলনার অর্থনৈতিক দশার বিবরণে বলেন - "খুলনার অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী, জেলার মাটি ও জলবায়ু ধান, সুপারি, নারিকেল উৎপাদনের উপযোগী। নৌপথের সুবিধার কারণে তারা সহজেই তাদের উদ্বৃত্ত বিক্রয় বাণিজ্যে সম্পৃক্ত থাকত। বেশিরভাগ লোক অন্যদের দিয়ে নিজ জমি চাষ করাত। এই যোগালীরা আসত অন্যান্য জেলা থেকে। ফসল এবং মাছের প্রাচুর্যের কারণে কৃষিজীবী পরিবারের নিজের জমি চাষ করত না"। উল্লেখ্য, এই ধারা এখনো খুলনায় বর্তমান। জেলার মোট কর্মক্ষম জনশক্তি, মোট আয়, মাথাপিছু আয় এবং মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ - এ সবই সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণের প্রধান নির্দেশক। ১৯৯৯/২০০০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, খুলনায় কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ১,৪৪৩ হাজার যার মধ্যে ৭১% পুরুষ। উল্লেখ্য, ১৯৯৫/৯৬ সালে কর্মক্ষম জনশক্তি ছিল ১,২৭৯ হাজার (যার মধ্যে ৬৮% পুরুষ) যা খুলনার পুরুষদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের কথাই তুলে ধরে (বি.বি.এস., ২০০১)। চলতি বাজার দর অনুযায়ী জেলার বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয় ২৩,১৩৫ টাকা। খুলনায় মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.০৫ হেক্টর এবং প্রায় ৪০% কৃষি শ্রমিক পরিবার (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

মাথাপিছু আয়	২৩,১৩৫
বি.বি.এস ক্রম (মাথাপিছু আয় অনুসারে)	০.০৫
মোট শিল্পে আয়	২১
স্থিরদরে বার্ষিক মোট আয় বৃদ্ধি	৫.৫
বিদ্যুৎ সংযোজনসম্পন্ন খানা	৪২

দারিদ্র্য

দরিদ্র	৫৫
অতি দরিদ্র	২৬
ভূমিহীন	৪৯
ক্ষুদ্র কৃষক	৫০

খুলনা জেলার মোট জনসংখ্যার ৫৫% দরিদ্র এবং ২৬% অতি দরিদ্র (বি.বি.এস.- ইউনিসেফ, ২০০১)। এ ছাড়া জেলার মোট ৪৯% লোক ভূমিহীন এবং ৫০% ক্ষুদ্র কৃষক।

নারীদের অবস্থান

অতি সম্প্রতি, সি.পি.ডি.-ইউ.এন.এফ.পি.এ বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মোট জনসংখ্যা, সাক্ষরতার হার এবং অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার বিচারে নারী-পুরুষের অসমতার একটি ধারাক্রম নির্ধারণ করে একটি লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়ন সূচক তৈরি করেছে। এতে দেখা যায় খুলনা জেলা "মাঝারি মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতার" এলাকা। এখানে নারীরা কঠোর পর্দা প্রথার মধ্যে বসবাস করে না। তাই বোরখা পরে বাইরে চলাচল, মাঠে, ক্ষেতে-খামারে কাজ করার প্রচলন রয়েছে । নগরায়ন, শিক্ষা, অনুকূল পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন আর দারিদ্র্য এই সবই পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান ও ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

লিঙ্গ অনুপাত : খুলনার মোট জনসংখ্যার ৪৮% নারী। জেলার লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০৯.৯, যা সমাজে নারীর নেতিবাচক অবস্থানকে নির্দেশ করে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (০-১৪ বছর) বয়স দলে লিঙ্গ অনুপাত ১০০: ১০৯। আবার প্রজননক্ষম বয়স দলে (১৫-৪৯ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০৬ (বি.বি.এস., ২০০১)।

বৈবাহিক অবস্থা : জেলার ১০ বছর ও তার উর্ধ্বে মোট জনসংখ্যা হল ১৮.২১ লাখ। এর মধ্যে ৩১% নারী বিবাহিত এবং ০.৫১% নারী স্বামী পরিত্যক্তা (বি.বি.এস., ২০০১)। এখানে বিয়ে নিবন্ধনের হার ৭১% (বি.বি.এস.- ইউনিসেফ, ২০০১)। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বস্ব হারিয়ে খুলনার আশে পাশের জেলা থেকে নারীরা এখানে অস্থায়ী আবাস গড়ে তোলে।

- **৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার জাতীয় হারের (৯২) তুলনায় কম।**
- **সাক্ষরতার হার (৫১%) জাতীয় হার (৪১%) এর তুলনায় বেশি।**
- **মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার জাতীয় হারের সমান।**
- **কৃষিজীবী নারী প্রধান গৃহের সংখ্যা জাতীয় সংখ্যার তুলনায় কম।**
- **জেলায় ১৫-৪৯ বয়সদলের ৩২% নারী খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে কর্মরত, যা জাতীয় (২৮%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৬%) তুলনায় বেশি।**
- **জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৫০%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় বেশি ।**
- **১৫-৪৯ বছরের লিঙ্গ অনুপাত (১০৬) জাতীয় অনুপাতের (১০০) তুলনায় বেশি।**
- **তালাকপ্রাপ্তা/স্বামী পরিত্যক্তা নারীর সংখ্যা (০.৫১%) জাতীয় সংখ্যার (০.৩৭%) তুলনায় বেশি।**

প্রজনন স্বাস্থ্য : জেলার নারীদের মোট প্রজনন হার ২.৮ (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)। অর্থাৎ একজন নারী তার জীবদ্দশায় গড়ে ২.৮ টি সন্তান জন্ম দেয়। পরিবার পরিকল্পনা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (FPMIS-১৯৯৯)-এর তথ্য অনুসারে, জেলায় মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫ জন, যা নানা প্রপঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত। খাদ্যের অসম বন্টন, ঝুঁকিপূর্ণ সন্তান জন্মদান, আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব যেমন, ডাক্তার, ক্লিনিক ও হাসপাতালের অভাব মায়েদের মৃত্যু হারকে প্রভাবিত করে। জেলার ১৩-৪৯ বয়স দলের মোট ৫০% নারী আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ৪১%।

শ্রম বিভাজন : নারী-পুরুষের কাজের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। নারীদের ঘরের মধ্যে কাজ করার প্রবণতা বেশি। ঘরের বাইরে নারীরা প্রধানত পারিবারিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম দেয়। তবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দারিদ্র্যের কষাঘাতে দরিদ্রতম নারীরা ঘরের বাইরে নানা ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হয়। বেঁচে থাকার তাগিদে তারা

শহরাঞ্চলে কাজ নেয়। শহর এলাকায় নারীরা মজুরি শ্রমিক হিসেবে কারখানা, বাসাবাড়ি ও নির্মাণ কাজে অংশ নেয়।

সমাজে নারীর গতি-প্রকৃতি কিছু প্রপঞ্চের উপর নির্ভরশীল। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় অনুশাসন ও জলাবদ্ধতা এই জেলার নারীদের গতিশীলতার প্রধান বাধা। তবে, নারীদের চলাচলের প্রকৃতি অনেকাংশেই সম্পদের সূচকের উপর নির্ভরশীল (কেয়ার, ২০০৩)। রাস্তা-ঘাটের ক্রম উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা, এনজিওদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম নারীদের বাইরের জগতের সাথে সম্পৃক্ত হতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

সক্রিয় শ্রমশক্তি : খুলনার নারীদের মধ্যে সক্রিয় শ্রমশক্তির হার ক্রমশ কমছে। গত ১৯৯৫-৯৬ সালে সক্রিয় শ্রমশক্তির অর্থাৎ ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে জনগণের ৩২% ছিল নারী। পরবর্তীতে ১৯৯৯-২০০০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২৯% এ (বি.বি.এস., ২০০১)। উল্লেখ্য, এর মধ্যে ২৮% নারীরা গ্রামীণ নারীদেরই উপস্থাপন করে। গ্রামীণ নারীরা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে পড়েই হোক আর দারিদ্র্যের কারণেই হোক, তারা সেই চিরায়ত অধস্তনতা ও পারিবারিক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। আর তাই, গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে ২.৪% নারী পরের জমিতে শ্রম দেয় (বি.বি.এস., ১৯৯৬)। উল্লেখ্য, খুলনার নারীরা চিংড়ি ঘের তৈরির কাজে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। জেলার ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে মাত্র ৩২% অর্থ বা খাদ্যের বিনিময়ে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ২৬%।

স্বাস্থ্য পুষ্টি : জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৯ জন, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় বেশি। জেলার মেয়ে শিশুদের মধ্যে অতি অপুষ্টির হার ২%, যা জাতীয় হারের তুলনায় কম এবং নারীর স্বাস্থ্যগত অবস্থান বিবেচনায় একটি ইতিবাচক দিক। তবে নিরাপদ পানি ও পয়ঃসুবিধার অভাব তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মাঠপর্যায়ের গবেষণা (২০০২, ২০০৩)-এ দেখা গেছে, খুলনার শহর ও গ্রামীণ এলাকায় নারীদের দূর-দূরান্ত থেকে নিরাপদ পানি বহন করে আনতে হয়। তাই অতিবর্ষা, জলাবদ্ধতা আর বন্যায় নারী অবর্ণনীয় সমস্যার মুখে পড়ে। এ ছাড়া পর্যাপ্ত প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অভাবে ৯২% নারীই ঘরে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন এবং ৬৫% ক্ষেত্রে আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশীরা সন্তান জন্ম নেয়ার সময় সহায়তা করেন। মাত্র ১৮% নারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের সেবা পান। আধুনিক ডাক্তারদের সেবাপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা ১৭% (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)। অর্থাৎ খুলনার স্বাস্থ্য অবকাঠামোর সংখ্যার তুলনায় নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাপ্রাপ্তির হার অনেক কম।

শিক্ষা : খুলনার নারীদের সাক্ষরতার হার সন্তোষজনক। কেননা ৭^{+} বয়সী মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার মাত্র ৫১% যা প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের সাক্ষরতার হার প্রায় (৫৩)-এর সমান (বি.বি.এস., ২০০১)। তবে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে খুলনার মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে পিছিয়ে আছে। মোট ছাত্রছাত্রীদের ৪৯% মেয়ে শিশু, যাদের বয়স ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশু ভর্তির হার ৯৮। একই চিত্র দেখা যায় স্কুল ও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে। স্কুলের মোট ছাত্রছাত্রীদের ৫১% ছাত্রী এবং মাদ্রাসায় মোট ছাত্রছাত্রীদের ৪৬% ছাত্রী (ব্যানবেইস, ২০০৩)। তবে কলেজগুলোতে ছাত্রী সংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় কম। মাত্র ৭০% ছাত্রী জেলার কলেজগুলোতে লেখাপড়া করে। অর্থাৎ খুলনা জেলার নারীদের উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ।

নারী নির্যাতন : ঘরের ভেতরে-বাইরে নারীরা প্রতিনিয়তই নানা ধরনে নির্যাতন ও শোষণের শিকার। জেলার দূর্বল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, মাস্তান ও উগ্রপন্থীদের দৌরাত্ম্য, সাম্প্রদায়িকতা, বনদস্যুদের প্রভাবে নারীরা ঘরে-বাইরে শারীরিক নির্যাতন, খুন ও অবমাননার শিকার। উল্লেখ্য, খুলনায় নারী পাচারের ঘটনাও ঘটছে।

অবকাঠামো

রাস্তা-ঘাট

বি.বি.এস.,২০০৩-এর সূত্রানুসারে, খুলনা জেলায় মোট ২,০৭০ কি. মি. পাকা রাস্তা রয়েছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগের মোট ৩১৩ বর্গ কি.মি. রাস্তা, ২৪৬ কি.মি. ফিডার রোড-এ ৩৪ কি.মি. আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ৩৩ কি.মি. জাতীয় মহাসড়ক। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের (এলজিইডি) ৩০৭ কি.মি. ফিডার রোড-বি, ৬২১ কি.মি. গ্রামীণ রাস্তা, ৮২৯ কি.মি. গ্রামীণ রাস্তা ধরন-২ রয়েছে। জেলায় রাস্তার ঘনত্ব ০.৪৭ কি.মি./ বর্গ কি.মি.।

রাস্তা-ঘাটের বিবরণ

মোট পাকা রাস্তা	২,০৭০ কি.মি.
সওজ রাস্তা	৩১৩ কি.মি.
এলজিইডি রাস্তা	৩০৭ কি.মি
রাস্তার ঘনত্ব	০.৪৭কি.মি./ বর্গ কি.মি.

উল্লেখ্য, খুলনা নগরীর অধিকাংশ রাস্তাঘাট যানবাহন চলাচলে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। বর্ষা মৌসুম ও ভূগর্ভস্থ কেবল লাইন বসানোর খোঁড়াখুঁড়ির কারণে রাস্তাগুলো চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এই রাস্তাগুলোর আশু সংস্কার করা প্রয়োজন। এ দিকে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের (কেসিসি) -র বিশেষ মনোযোগ দেয়া দরকার।

রেল-পথ

খুলনার যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৮৮৪ সালে খুলনা ও পশ্চিমবঙ্গের দমদম জংশন স্টেশনের রেল সংযোগ স্থাপিত হয়। এখানে ৩৬ কি.মি. দীর্ঘ রেলপথ আছে ও ফুলতলা, কোতোয়ালি ও দৌলতপুর উপজেলার উপর দিয়ে এই রেলপথ অতিক্রম করেছে।

উপজেলা ভিত্তিক রেলপথের বিবরণ

উপজেলা	রেল পথ(কি.মি.)
ফুলতলা,	১২.২০
কোতোয়ালি	১.০০
দৌলতপুর	৩.২০
মোট	১৬.৪

খুলনা জংশন, দৌলতপুর কলেজ, দৌলতপুর, শিরোমণি, ফুলতলা এবং বেজেরডাঙা জেলার মোট ছয়টি রেল স্টেশন । অতিসম্প্রতি ঢাকার সাথে খুলনার সরাসরি রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নৌ-পথ

খুলনা জেলায় নৌপরিবহনের সুপ্রাচীন ইতিহাস আছে। জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থায় নৌপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। ১৯০৮ সালে জেলায় খুলনা নারায়ণগঞ্জ স্টীমার সার্ভিস চালু হয়। বর্তমানে এখানে রকেট স্টীমার সার্ভিস চালু আছে। জেলায় মোট ৪৭০ নটিক্যাল মাইল নৌ-পথ রয়েছে। জেলায় ৫টি উপজেলার মধ্যেকার নৌপথের পরিমাণ ৩৩৮ নটিক্যাল মাইল।

১৯৪৭-এর পাক-ভারত বিভক্তির পরে নদী বন্দর হিসেবে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। টোনা, টেকানিয়া, মানিকদাহ খুলনার প্রধান কয়টি স্টীমার ঘাট। ১৯৬৮ সাল থেকে এই জেলায় বেশ কটি লঞ্চ সার্ভিস চালু হয়। বর্তমানে এখানে ১টি নৌ টার্মিনাল ও ১৯টি লঞ্চঘাট আছে। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার অভাবে লঞ্চঘাটগুলোর অবস্থা শোচনীয়।

উপজেলা ভিত্তিক নৌপথের বিবরণ

উপজেলা	নৌপথ (নোটিক্যাল মাইল)
বটিয়াঘাটা	১৯৪
দাকোপ	৫৭
ডুমুরিয়া	৩২
দিঘলিয়া	৩৮
পাইকগাছা	১৫
কোতোয়ালি	২
মোট	৩৩৮

বৃহত্তর খুলনা জেলার আঞ্চলিক দূরত্ব কমিয়ে আনা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের লক্ষ্যে ক'টি সেতু নির্মাণের বহু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ও জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (JBIC)-র অর্থায়নে ২০০১ সালের মে মাসে রূপসা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে এটির নির্মাণ কাজ শেষ হবার কথা। এই সেতু নির্মাণের ফলে মংলা বন্দর ও সারা বাংলাদেশের সাথে খুলনার যোগাযোগ আরো নিবিড় হবে। এই সেতু মংলাবন্দর পুনঃউদ্ধারে সাহায্য করবে। এটি প্রতিবেশী দেশ নেপাল ও ভুটানের সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করবে। তবে, স্থানীয় রাজনৈতিক অপতৎপরতা ও মাস্তানদলের চাঁদাবাজি ও হুমকির কারণে এই সেতু নির্মাণ কাজ পিছিয়ে গেছে। অন্যদিকে অর্থ বরাদ্দের অভাবে বটিয়াঘাটা সেতু নির্মাণের কাজ বন্ধ রয়েছে। প্রায় ৬০% কাজ শেষ হবার পরে গত বছরে প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে দেয়ার ফলে সেতু নির্মাণ ব্যয়ের অর্থ গচ্চা যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে।

পোল্ডার

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষার তাগিদে বিগত ষাটের দশকে খুলনা জেলায় পোল্ডার নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এক সময় 'অষ্টমাসী' বাঁধের সাহায্যে জেলার নিম্ন অঞ্চলকে প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করা হতো। তৎকালীন জমিদারদের প্রবর্তিত পানি ব্যবস্থাপনার এই স্থানীয় কৌশলটিই সেই সময়ে "পোল্ডার"-এর বিকল্প হিসেবে কাজ করত।

পোল্ডার	২৬টি
বাঁধ	৮৮০ কি.মি.
রেগুলেটর	২২৩টি
নিষ্কাশন খাল	৫৮৪ কি.মি.
ফ্লাশিং আউটলেট	২৫৮টি

জেলার পাইকগাছা, কয়রা, ডুমুরিয়া, ফুলতলা, বটিয়াঘাটা, দাকোপ উপজেলায় মোট ২৬টি পোল্ডার রয়েছে। যাদের মাধ্যমে ১,৭৪,৯৯২ হেঃ জমি রক্ষা করা হয়েছে । পোল্ডার এলাকার মধ্যে রয়েছে ৮৮০ কি.মি. দীর্ঘ প্রতিরক্ষা বাঁধ, ২২৩টি রেগুলেটর, ২৫৮টি ফ্লাশিং আউটলেট এবং ৫৮৪ কি.মি. দীর্ঘ নিষ্কাশন খাল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা জরুরি যে, পোল্ডার-১৬ একযোগে পাইকগাছা ও তালা এবং পোল্ডার-২৪ একযোগে খুলনা ও যশোরের ডুমুরিয়া (অভয়নগর), কেশবপুর ও মনিরামপুরের জন্য তৈরি করার কারণে পোল্ডার এলাকা, প্রতিরক্ষা বাঁধ, রেগুলেটর, ফ্লাশিং আউটলেট ও নিষ্কাশন খালের দৈর্ঘ্য ও সংখ্যা একসাথে হিসেবে ধরা হয়েছে (সি.ই.আর.পি, ২০০০)। এই সমস্ত কাঠামোর মাধ্যমে জেলার পানি ব্যবস্থাপনার কাজটি চলে।

উল্লেখ্য, জেলার উপকূলবর্তী বাঁধ ও প্রতিরক্ষা বাঁধের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ বা তদারকি করার পর্যাপ্ত কোন ব্যবস্থা নেই। পানি ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি, অনিয়ম, এলাকাবাসীর অসচেতনতা, প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য-সহযোগিতার অভাব, দুর্বল বাঁধ, বাঁধের ফাটল, জেলার নদী ভাঙনের তীব্রতাকে ত্বরান্বিত করে। ফলে এসব এলাকায় লোনা জলের প্রবেশ, প্লাবণ, ফসলহানি ইত্যাদি সমস্যা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে।

খুলনা মহানগরীর নিষ্কাশন অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে ১৮০ কি.মি. পাকা, ৫০ কি.মি. আধা পাকা, ৩০০ কি.মি. কাঁচা নিষ্কাশন নালা ও ১০ টি নিষ্কাশন খাল। এলজিইডি বিগত ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছর থেকে ১৯৯৯ সালে ড্রেনেজ প্রকল্পের আওতায় এই অবকাঠামোগুলো নির্মাণ করে।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

জেলার বিভিন্ন স্থানে মোট ৩৪টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে (এল.জি.ই.ডি, ২০০৩)। জেলার মোট জনসংখ্যার ৩% জনগণ এতে আশ্রয় নিতে পারে। এগুলো ঘূর্ণিঝড়ের সময় জানমালের নিরাপত্তা দেয় আর অন্য সময়ে বিদ্যালয়

ও খাদ্য গুদাম হিসেবে ব্যবহার হয়। তবে, সুন্দরবন উপকূল ও চরাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো দরকার।

হাট-বাজার ও বন্দর

রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, মানুষের চাহিদা, ভোগ্যপণ্যের বিস্তারের কারণে জেলায় হাট বাজারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। জেলায় মোট ১৯৮টি হাট বাজার রয়েছে (বি.বি.এস., ১৯৯৮)।

হাটবাজারের খতিয়ান

উপজেলা	সংখ্যা
বটিয়াঘাটা	২৬
দাকোপ	৮
ডুমুরিয়া	৪২
কয়রা	২০
পাইকগাছা	১৯
ফুলতলা	১২
রূপসা	১৬
তেরখাদা	৮
খালিশপুর	৪
খানজাহান আলী	২
কোতোয়ালি	৬
দৌলতপুর	৩০
সোনাডাঙ্গা	৫
মোট	১৯৮

লঞ্চ ও ফেরিঘাটের সংখ্যা বাড়ানো হলে জেলার উৎপাদিত বা আহরিত কৃষিপন্য বাজারজাত করার সুবিধা বাড়বে এবং তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ঘুচবে।

বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ

খুলনা জেলা শহর প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পর ১৯৩৪ সালে বিদ্যুৎ সংযোগ আসে। তবে এর আগে রেলওয়ে হাসপাতাল রোডে ডায়নামোর সাহায্যে কিছু এলাকায় বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা ছিল। মূলত ১৯৩৫ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে শহরের সরকারি বাসভবন, হাসপাতাল ও পৌরসভা অফিস, আবাসিক এলাকা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসহ রাস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা শুরু হয়।

শহরে বিদ্যুৎ সংযোগ	৬৯%
গ্রামীণ বিদ্যুৎ সংযোগ	১০%
পল্লী বিদ্যুৎ সংযোগ	৩৮৮১ বর্গ কি.মি.
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা	৬৪ মেগাওয়াট

খুলনা জেলায় বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘরের সংখ্যা ২,০৯,১৮০, যা মোট ঘরের ৪২%। তবে শহর ও গ্রামে বৈদ্যুতিক সংযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। শহরের ৬৯% ঘরের বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। অথচ গ্রামে মাত্র ১০% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। এই হার খুলনার সম্প্রসারিত নগরায়নের মাত্রাকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে জেলার মাত্র ২২% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল (বি.বি.এস., ১৯৯৪, ২০০১) ।

জেলার প্রধান পাওয়ার স্টেশনটি খুলনা সদরে অবস্থিত। এখানে মোট ৪টি ইউনিট সক্রিয় রয়েছে। এই পাওয়ার স্টেশনটির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৬৪ মেগাওয়াট। পল্লী বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যশোর-২ এবং খুলনা স্টেশন থেকে সমগ্র জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। উল্লেখ্য, ফুলতলা ও তেরখাদা উপজেলার কিছু অংশ যশোর-২ স্টেশনের আওতাভুক্ত। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় এ যাবৎ বটিয়াঘাটা, দাকোপ, ডুমুরিয়া, কয়রা ও পাইকগাছা উপজেলার মোট ৩,৮৮১ বর্গ কি.মি. এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে ।

এ ছাড়া খুলনা জেলায় ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ১৫৮২টি সৌর পদ্ধতি বিক্রি হয়েছে। এদের সৌরশক্তির পরিমাণ ৮,১৮০ ওয়াট। জেলার কামারুলের "কামারুল স্বাস্থ্য ক্লিনিক"-এ সৌর বিদ্যুৎতায়ন শেষ হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের "টেকসই গ্রামীণ শক্তি" প্রকল্পের আওতায় সৌর বিদ্যুৎতায়নের কাজটি সম্পন্ন করা হয়।

টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে ১৯৬৫ সালে খুলনার সাথে ঢাকার সরাসরি ডায়াল ব্যবস্থা চালু হয়। এছাড়া সে সময় জনগণের টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিত করতে 'পাবলিক কল' সার্ভিস চালু করা হয়। বর্তমানে জেলায় মোট টেলিফোন সংযোগের সংখ্যা ৭,৯৭০টি (বি.বি.এস., ১৯৯৮)।

শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো

বিভাগীয় শহর, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কাঁচা মালের বিপুল সমারোহকে কেন্দ্র করে খুলনায় বড় বড় কল-কারখানা গড়ে উঠেছে, যা একে শিল্প শহরের মর্যাদা দিয়েছে। এখানে ১৯৬১-১৯৭৪ সালের মধ্যে ব্যাপক শিল্প প্রসার ঘটে। খুলনা জেলা মোগল আমলে লবণ তৈরি ও খেজুর রসের চিনি শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। ব্রিটিশ অধ্যায়ে এর অবসান ঘটে। তবে ১৯৫০-এর পরবর্তীকালে জেলায় শিল্প বিস্তার ঘটতে শুরু করে। ১৯৫০-৭০-এর দশকে বড় মাপের কিছু শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে।

শিল্প কল কারখানা	**পেপার মিল, হার্ডবোর্ড মিল, টেক্সটাইল মিল, দিয়াশলাই কারখানা, মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, স্টীল মিল, বৈদ্যুতিক তার কারখানা, চাল ও ময়দার কারখানা, বরফকল, প্রেস, ঔষুধ তৈরির কারখানা, কাঠের কারখানা ইত্যাদি**
শিল্প এলাকা	**শিরোমণি, খালিশপুর, বয়রা ও রূপসা**
বাণিজ্য কেন্দ্র	**খুলনা শহর, দৌলতপুর, ফুলতলা, আলাইপুর, কপিলমুনি ও ডুমুরিয়া**

উল্লেখযোগ্য শিল্প কল-কারখানার মধ্যে রয়েছে পেপার মিল, হার্ডবোর্ড মিল, টেক্সটাইল মিল, দিয়াশলাই কারখানা, স্টীল মিল, বৈদ্যুতিক তার কারখানা, চাল ও ময়দার কারখানা, বরফকল, প্রেস, কাঠের কারখানা ইত্যাদি। পরবর্তীতে এখানে ঔষুধ তৈরির কারখানাও গড়ে ওঠে। এছাড়া ১৯৬৩ সালে এখানে প্রথম কোল্ড স্টোরেজ বা মাছ প্রক্রিয়াজতকরণ কারখানা স্থাপিত হয়। মূলত বহুসংখ্যক শিল্প কল-কারখানার উপস্থিতি একে নগর পরিচিতি এনে দেয়। অকৃষি খাতে জনগণের অংশগ্রহণ কম। খুলনার শিল্প এলাকা বলতে শিরোমণি, খালিশপুর, বয়রা ও রূপসাই প্রধান। আর খুলনা শহর, দৌলতপুর, ফুলতলা, আলাইপুর, কপিলমুনি ও ডুমুরিয়া উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র।

জেলার মোট ২.৭% গ্রামীণ গৃহস্থালির ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা রয়েছে (কৃষি শুমারি ১৯৯৬)। ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার মধ্যে তাঁতী, বাঁশের কাজ, কামার, কুমার প্রধান। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশের একটি অন্যতম উদাহরণ হল শিরোমণি এলাকার শিল্পনগরী যেটি ৪২ একর জমির উপর গড়ে উঠেছে। ২৩৪টি প্লটে বিভিন্ন শিল্প উদ্যেক্তারা তাদের সংগঠন করে তুলেছে। নগরকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা যেমন, পাকা রাস্তা, বিদ্যুৎ, পানি ও পয়ঃ সুবিধা, ডাকঘর, ব্যাংক - এ সবই রয়েছে এই শিল্পনগরীতে। এ ছাড়াও জেলায় মোট ৩,৪০৯টি চিংড়ি ঘের, ৪৯৮টি দুগ্ধজাত খামার আছে।

এছাড়া ১৯৯৯ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে জেলার দাকোপ উপজেলার মোট ৩টি পাইকগাছায় ২০০১ সালে ১টি হ্যাচারি স্থাপিত হয়। উল্লেখ্য, খুলনা জেলা চিংড়ি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও এখানে হ্যাচারির সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। চিংড়ি খামারগুলোতে কক্সবাজার থেকে নিয়মিতভাবে কার্গো বিমানে চিংড়ি পোনা সরবরাহ করা হয়। পরিবহন খরচ ও পোনার বাজারমূল্য চাহিদা সরবরাহের বিচারে এতে লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণই বেশি। তাই অবিলম্বে জেলায় চিংড়ি হ্যাচারি সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া দরকার। এতে অনেক খরচ সাশ্রয় এবং উপযুক্ত চিংড়ি পোনা সরবরাহ নিশ্চিত হবে।

মৎস্য অধিদফতরের (২০০৩) তথ্য অনুযায়ী জেলায় মোট ৪টি মৎস্য সেবাকেন্দ্র রয়েছে, যা জেলার মৎস্য চাষের সম্ভাবনা ও চর্চার তুলনায় অপ্রতুল। পরিকল্পিত মৎস্য চাষ নিশ্চিত করতে এর সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

এক সময় খুলনায় লবণ উৎপাদিত হতো। সেই সময় সুন্দরবন এলাকা থেকে লবণাক্ত মাটি সংগ্রহ করে পাতন প্রক্রিয়ায় লবণের দ্রবণ সংগ্রহ করে জ্বাল দিয়ে লবণ তৈরি হতো। এই প্রক্রিয়ায় খুব কম পরিমাণে লবণ উৎপাদন সম্ভব হতো। ১৯৬৬ সালে লবণ তৈরির উপর পরিচালিত এক জরিপে জানা যায়, সে সময় পাইকগাছায় ২১১টি লবণের খামার, মোট ৫৯৯ জন লোক কাজ করত এবং ৯৮৫৪ মণ লবণ উৎপাদিত হতো। খুলনা জেলার কিছু অংশে লবণ উৎপাদনের সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়েছে। ১৯৯৩ সালে বিসিক খুলনার দাকোপ ও কয়রা উপজেলায় দুটো পরীক্ষামূলক লবণ উৎপাদন ও প্রদর্শনী কেন্দ্র চালু করে এবং সৌর পদ্ধতিতে চাতালে লবণ উৎপাদনের উপর হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে, খুলনা-সাতক্ষীরা অঞ্চলে লবণ উৎপাদন ও এতে স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিসিক "খুলনা-সাতক্ষীরা লবণ শিল্পের উন্নয়ন প্রকল্প"টি হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের আওতায় জমি লিজ বা বন্দোবস্ত, লবণ চাষী ও ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ, নমুনা মাঠ তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এই প্রকল্পটি সাদা লবণ উৎপাদনের কারিগরি শিক্ষা ও গবেষণা এবং কাজের সুযোগ সৃষ্টিতে সাহায্য করছে। এই তথ্য প্রমাণ করে যে, খুলনা জেলায় লবণ শিল্পের পুনরুদ্ধার ও বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

সেচ ও গুদাম সুবিধা

জেলার কৃষিজীবী লোকেরা আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী - দুই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। এখানে আধুনিক সেচ প্রযুক্তি বলতে নলকূপ, গভীর ও অগভীর নলকূপ, এল.এল.পি. পাম্প ইত্যাদি বুঝায়।

মোট সেচ এলাকা	৩২,৭০০ হে.
সেচ এলাকা (%)	৪৩.০%
ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার	১৫.৯%
উপরিভাগের পানি ব্যবহার	২৭.২%

তবে জেলায় সক্রিয় অগভীর নলকূপের সংখ্যা ২৬৮৩টি এবং এল.এল.পি ১৪০৮টি। এসব প্রযুক্তির আওতায় ১৫,২২৩ হে. জমিতে সেচ দেয়া হয় (বি.বি.এস., ১৯৯৮)।

এছাড়া জেলায় বিভিন্ন ধরনের পণ্যদ্রব্য গুদামজাতকরণের সুবিধা রয়েছে। (বি.বি.এস., ১৯৯৮)-এর অনুসারে এই জেলায় মোট ৩৫টি খাদ্যগুদাম রয়েছে। যাদের প্রতিটির খাদ্যদ্রব্য ধারণ ক্ষমতা হল ৩৬,১০০ মে. টন। এ ছাড়া এখানে বীজ সংরক্ষণের জন্য ৪,১০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতার ১৪টি গুদাম আছে। আর সারের জন্য রয়েছে ১,৭৫০ মে. টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি গুদাম।

গুদামের ধরন	সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা (মে.টন)
খাদ্য	৩৫	৩৬,১০০
বীজ	১৪	৪,১০০
সার	৪	১,৭৫০

সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ২,১৯৫টি সমবায় সমিতি, ৩৪৫টি বিভিন্ন ধরনের ক্লাব, ১৬৩টি পোস্ট অফিস, ১৪২টি বিভিন্ন শাখা ব্যাংক, ৫৯টি কম্যুনিটি সেন্টার ও ৩৮টি পেশাজীবী সংগঠন রয়েছে। ৫টি গণগ্রন্থাগার, ১টি জাদুঘর বা খুলনা বিভাগীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, ৫টি নাট্যমঞ্চ, ২১টি সিনেমা হল, ১০০টি থিয়েটার দল, ৩টি জাদুবিদ্যা সংগঠন ও ২০টি সাংস্কৃতিক সংগঠন রয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মোট ১৫০০টি মসজিদ, ৪টি বৌদ্ধ মঠ, ৬৪৬টি মন্দির, ২২টি খ্রিস্টান উপাসনালয় ও ৩টি তীর্থস্থান রয়েছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান

১৯৭৬-৭৭ সালে খুলনায় মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়। এ ছাড়া মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ-এর অধীনে খুলনার পাইকগাছায় দেশের একমাত্র মৎস্য গবেষণা উপকেন্দ্র "লোনা পানির স্টেশন পাইকগাছা" প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৭ সালে। লোনা পানির মাছ চাষ, চিংড়ি পোনা, চিংড়ি প্রজনন ক্ষেত্রে, ম্যানগ্রোভ ইকোলজি, বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক লোনা পানির মাছ, কাঁকড়া, শামুক, শৈবাল ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ের উপর গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ পরিচালনার উদ্দেশ্যে এটি স্থাপিত হয়। মোট ৩০.৫৬ হে. জমির উপর ০.১ - ১.০ হে. আয়তনের ৫২টি নিষ্কাশনক্ষম পরীক্ষামূলক পুকুর, একটি পরীক্ষামূলক হ্যাচারি, একটি মাছের

রোগ পুষ্টি-মাটি-পানি বিশ্লেষণের গবেষণাগার নিয়ে এই স্টেশনটি গঠিত। এটি ৮টি ভাগে বিভক্ত, যেমন, প্রশাসন প্রজনন বিভাগ, পুষ্টি খাদ্য, দূষণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ, লোনাপানির মাছ চাষ, মোহনার ইকোলজি ও পরিবেশ, মাটি-পানি ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং মাছ চাষের প্রযুক্তিবিদ্যা। এই উপকেন্দ্রটির গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবে ব্যাপকভাবে কাজে লাগছে। সম্প্রতি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেরিন বায়োলজি বিভাগ খোলা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০০৪-২০০৫ অনুসারে খুলনায় মোট ১৩টি সরকারি সংস্থার মোট ৩১টি প্রকল্প জেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, এখানে যেসব প্রকল্প ২০০৪ সালের জুন মাসের পরেও চালু আছে ও থাকবে তাদের হিসেব এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যে সমস্ত সরকারি সংস্থার মাধ্যমে এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে, তা হল বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর,বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, মহিলা বিষয়ক অধিদফতর, মৎস্য বিভাগ, বন বিভাগ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, মহিলা বিষয়ক অধিদফতর, ইত্যাদি। এই প্রকল্পগুলো প্রধানত বাংলাদেশ সরকার, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, নেদারল্যান্ডস সরকার, যুক্তরাজ্য সরকার, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী, ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাসিলিটি, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইউনিসেফ, কুয়েত সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন। প্রধান কয়টি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হল - পানি উন্নয়ন বোর্ডের "টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (ইপসাম)", স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের "বৃহত্তর খুলনা জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প" ও বন বিভাগের "সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প"। মৎস্য বিভাগের অন্যতম প্রধান প্রকল্পটির নাম সামুদ্রিক চিংড়ি চাষ প্রকল্প। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের গ্রামীণ পানি ও পয়ঃ সুবিধা প্রকল্প, সওজ-এর রূপসা সেতু ও শহর বাইপাস সংযুক্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্পসহ বিসিকের "খুলনা-সাতক্ষীরা অঞ্চলে লবণ শিল্প উন্নয়ন" প্রকল্পের নাম উল্লেখযোগ্য।

সরকারী সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	৩
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর	২
বন বিভাগ	১
পরিবেশ বিভাগ	৩
মৎস্য বিভাগ	১
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর	২
সড়ক ও জনপথ বিভাগ	৫
মহিলা বিষয়ক অধিদফতর	২
বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি	১
কেডিএ ও কেসিসি	৪
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	৪
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	২

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জেলার স্থানীয় ও জাতীয় বেসরকারি সংস্থাগুলোও কাজ করছে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন-১, ব্র্যাক, কেয়ার, সুশীলন, উন্নয়ন, সিডিপি, প্রদীপণ, নিজেরা করি, কারিতাস ও প্রীতি, কেয়ার-বাংলাদেশ জেলার অন্যতম কয়েকটি এনজিও। এন.জি.ও-র ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণ গ্রহণ করেছে জেলার মোট ২৭% গৃহস্থ। ঋণ গ্রহীতার মোট ঋণের পরিমাণ জনপ্রতি ৬,১৭৩ টাকা। উল্লেখ্য, জেলায় মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ১,৩১,৮৯১ জন এবং মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৮১৪.১ মিলিয়ন টাকা (পিডিও-আইসিজেডএমপি, ২০০৩)।

ক্ষুদ্রঋণ কর্মকাণ্ডের খতিয়ান	
ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারী গৃহস্থ (জন)	১,৩১,৮৯১
% গৃহস্থ (মোট)	২৭%
মোট ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকা)	৮১.৪১
গৃহস্থ প্রতি ঋণের পরিমাণ (টাকা)	৬,১৭৩

হোটেল বা অবকাশযাপন কেন্দ্র

নগর সংস্কৃতি, বিভাগীয় শহর ও শিল্প নগরীর মর্যাদার কারণে এখানে বহু হোটেল, রেস্টুরেন্ট, গেস্ট হাউজ গড়ে উঠেছে। নগরীর ব্যস্ততম এলাকা (যেমন, লোয়ার যশোর রোড) থেকে শুরু করে আবাসিক এলাকা (যেমন, সোনাডাঙ্গা)-য় বেশ ক'টি নামিদামি তিন তারা হোটেল, মোটেল ও গেস্ট হাউস রয়েছে। তবে, নগরীর বাইরে সুন্দরবনের ধারে কাছের লোকালয়ে কোন হোটেল বা অবকাশযাপন কেন্দ্র নেই। কিন্তু, যেহেতু খুলনা জেলা

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যটন এলাকা, তাই এখানে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও ব্যক্তিখাতের উদ্যোগে পর্যাপ্তসংখ্যক হোটেল, মোটেল বা অবকাশযাপন কেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন। এসব হোটেলে আন্তর্জাতিক মানের থাকা-খাওয়ার সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া সুন্দরবনের নালা-খালে ভাসমান পর্যটন তৈরি বা নৌ-বিহারের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

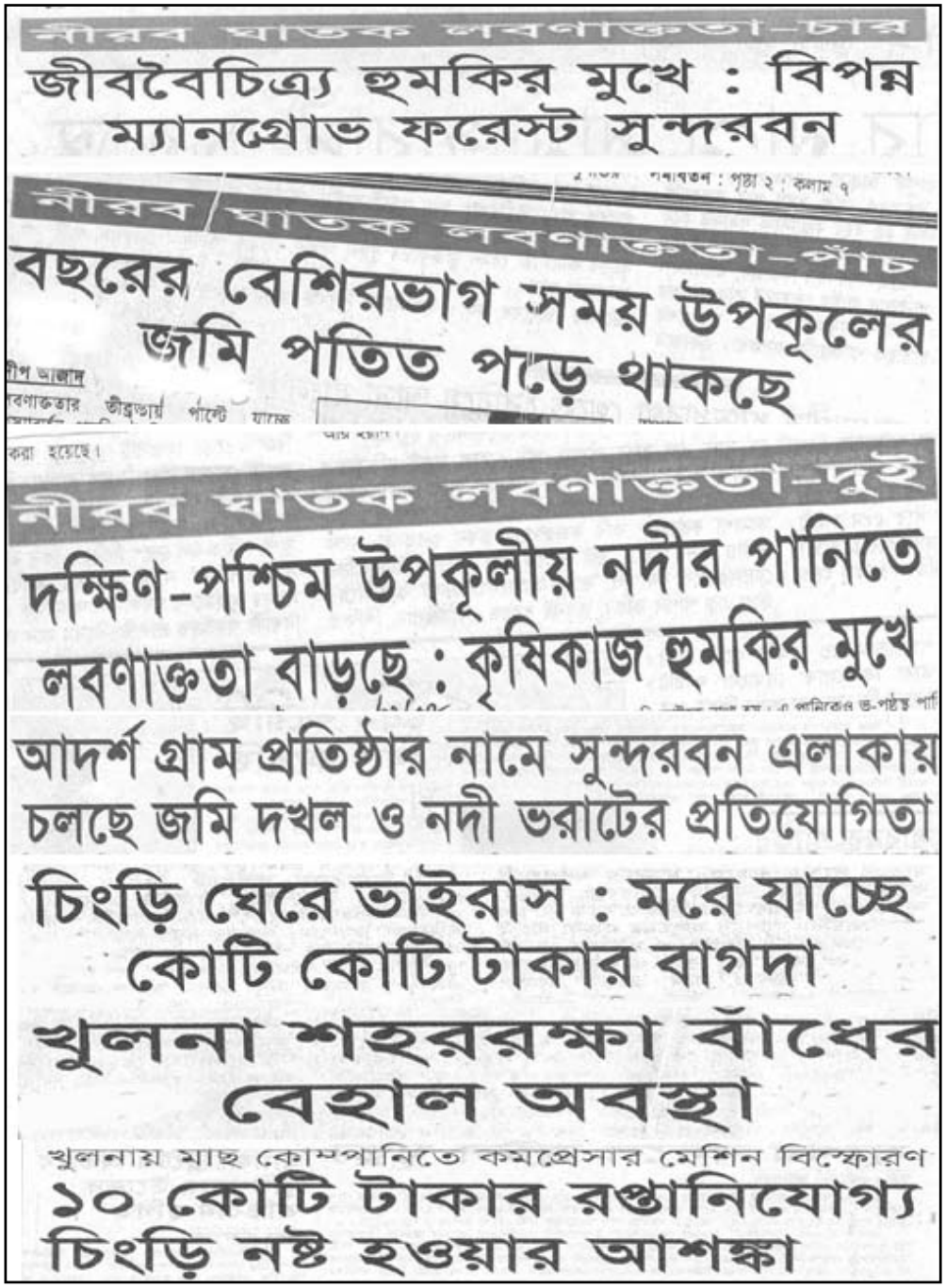

নীরব ঘাতক লবণাক্ততা-চার

জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে : বিপন্ন ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন

নীরব ঘাতক লবণাক্ততা-পাঁচ

বছরের বেশিরভাগ সময় উপকূলের জমি পতিত পড়ে থাকছে

নীরব ঘাতক লবণাক্ততা-দুই

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় নদীর পানিতে লবণাক্ততা বাড়ছে : কৃষিকাজ হুমকির মুখে

আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠার নামে সুন্দরবন এলাকায় চলছে জমি দখল ও নদী ভরাটের প্রতিযোগিতা

চিংড়ি ঘেরে ভাইরাস : মরে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকার বাগদা

খুলনা শহররক্ষা বাঁধের বেহাল অবস্থা

খুলনায় মাছ কোম্পানিতে কমপ্রেসার মেশিন বিস্ফোরণ

১০ কোটি টাকার রপ্তানিযোগ্য চিংড়ি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

খুলনা জেলার মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক এবং নিজেদের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ এবং প্রতিবন্ধকতার প্রভাব অপরিসীম। অপরিকল্পিত অবকাঠামো ও দুর্বল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং অসচেতনতার কারণে সামগ্রিক প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই এসব সমস্যার মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। ২০০৩ সালে এই জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের সাথে এই বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে, সমাজের মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ, সম্পদের বন্টন বা ব্যবহার, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্টি হওয়া কিছু প্রধান সমস্যার কথা আলোচিত হয়। এ ছাড়া মাঠপর্যায়ের গবেষণা (২০০২, ২০০৩) ও আলোচনা (২০০৩) থেকে জেলার মানুষের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার যে চিত্র ফুটে উঠে, তার উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

পরিবেশগত সমস্যা

অবাধ বৃক্ষনিধন ও বন উজাড়, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, অনিয়ন্ত্রিত চিংড়ি পোনা আহরণ, ভারতের সাথে অভিন্ন নদ-নদীর পানি বন্টন সমস্যা, কচুরিপানাপূর্ণ ডোবা-নালা, ভূ-গর্ভস্থ পানির অত্যধিক আহরণ, অপরিকল্পিত বাঁধ, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সর্বোপরি পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব সুন্দরবনসহ জেলার সামগ্রিক পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলছে। তাই, যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের সাথে সাথে জাতীয় গণমাধ্যম বা প্রচার মাধ্যমে পরিবেশ বিপর্যয়, তার কারণ ও জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালানো প্রয়োজন।

পরিবেশগত সমস্যা
- জলাবদ্ধতা
- লবণাক্ততা
- সাইক্লোন
- কালবৈশাখী/টর্নেডো
- সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা
- নদী শাসন
- সুন্দরী গাছের আগামরা রোগ
- জীব প্রজাতি হ্রাস
- প্যারাবন উজাড়
- আর্সেনিক দূষণ
- জলবায়ুর পরিবর্তন

আর্থ-সামাজিক
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- ভূমি ব্যবস্থাপনা
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি
- শিল্প দূষণ
- নগর দূষণ
- জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি
- বনদস্যুদের প্রভাব
- চিংড়ি পোনা ধরা
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

পর্যটন শিল্প
- উপযুক্ত অবকাঠামো অভাব
- নিরাপত্তা ব্যবস্থা
- পর্যটন গাইড

যোগাযোগ
- অবকাঠামো উন্নয়ন
- সেতু/ব্রিজ নির্মাণ

জলাবদ্ধতা : জলাবদ্ধতার কারণে কৃষি কাজ ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। বিল এলাকার কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ও পরিবেশগত ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন, জোয়ার-ভাটার বেসিন তৈরি করে নিয়ন্ত্রিত পলি প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, নতুন ও পুরান বাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার, পানি ব্যবস্থাপনা ও শক্তিচালিত পাম্প বা Wind mill-এর মাধ্যমে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ইত্যাদি। এছাড়া জলাবদ্ধতা নিরসনে সমন্বিত মাছ চাষ ও পরিকল্পিত চিংড়ি চাষ পদ্ধতির প্রসার ঘটাতে হবে।

লবণাক্ততা : মাটি-পানির লবণাক্ততা জেলার মানুষের জীবনকে আক্রান্ত করছে বেশি। গ্রামে খাবার পানির সংকট দিনদিন তীব্রতর হচ্ছে। কৃষকরা সেচের পানি পাচ্ছে না। খুলনা নগরীর পানিতে লবণের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। ফলে, স্বাভাবিক কৃষিকাজ ও শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। প্রস্তাবিত নদী সংযোগ প্রকল্প (River Link Project) বাস্তবায়িত হলে ভূ-উপরিস্থিত পানির লবণাক্ততা আরো বাড়বে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

মাটিতে লবণ বেড়ে যাওয়ায় গ্রীষ্মকালীন ফসল (আউশ), শুকনা মৌসুমের ফসল (বোরো) ও রবিশস্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে, যা জেলার কৃষিখাতকে প্রভাবিত করছে।

সাইক্লোন : সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে সুন্দরবন উপকূলের মানুষের জীবন চরমভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। আপদকালীন নিরাপত্তার অভাব ও অপর্যাপ্ত বিপদ সংকেত জেলার মানুষ ও সম্পদের অবর্ণনীয় ক্ষতিসাধন করে। দারিদ্র্য, দুর্বল ভৌত অবকাঠামো, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ বা বিপর্যয় মোকাবিলার স্বল্প প্রস্তুতি এবং উপকূলের ঘনবসতির কারণে ঘূর্ণিঝড়ে সর্বোচ্চ ক্ষতির আশংকা থেকেই যায়।

কাল বৈশাখী/টর্নেডো : প্রতি বছর মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত কালবৈশাখীর আশংকা থাকে। কালবৈশাখীর আঘাতে জেলার ক্ষেত-খামার, জনপদ, গো-সম্পদ ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হয়।

নদী ভরাট : জেলার নদী-নালা খালগুলো ক্রমশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তাই জেলার সার্বিক পানি ব্যবস্থাপনা আজ ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন। নদী ভাঙন প্রতিরোধ, মরা নদী পুনরুদ্ধার (যেমন, হামকুড়া), পলি নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, খাল-নালার পুনঃখনন ও সংস্কারের মাধ্যমে জোয়ার-ভাটার নদীগুলোর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা দরকার। নদী শাসন সমস্যার অবসানে স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

নদী দূষণ : খুলনার বড় দুটো নদী রূপসা ও পশুর আজ অতিমাত্রায় দূষণের শিকার। লবণাক্ততা বৃদ্ধি, চিংড়ি ঘের, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার বর্জ্য, ফেরীঘাটের বর্জ্য পদার্থ নদীর পানিকে দূষিত করে চলেছে। উল্লেখ্য, জেলায় বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা বা Waste Water Treatment সুবিধা নেই।

সুন্দরী গাছের আগামরা রোগ : আগামরা রোগে সুন্দরী গাছের কাঠের গুণাগুণ নষ্ট হয়। ছত্রাকে আক্রান্ত গাছের শতকরা ৪২% করে নষ্ট হয়। যার অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। তাই, যথাযথ উপায়ে আক্রান্ত গাছ কাটা ও নতুন গাছ জন্মানোর পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এটি গাছের পুনর্জন্ম বা Regeneragion নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত জরুরি।

জীব প্রজাতি হ্রাস : সুন্দরবন বিলীন হয়ে যাবার লক্ষণগুলো আজ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে সুন্দরবনের লতা-গুল্ম, গাছপালা, পশুপাখীর অনেক প্রজাতিই হারিয়ে গেছে ও হুমকির সম্মুখীন। তাই, অবৈধ উপায়ে বাঘ, হরিণ, পাখী ও অন্যান্য প্রাণী শিকার প্রতিরোধ করতে হবে। সাগর উপকূলে অতিরিক্ত মাছ আহরণ ও চিংড়ি পোনা ধরার সাগরের মাছের প্রজাতির হ্রাস পাচ্ছে।

প্যারাবন উজাড় : প্যারাবন উজাড় জেলার প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে দিন দিন সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। মানুষের অসচেতনতা, জ্বালানি সংকট, দুর্বল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে বন কেটে উজাড় করা হচ্ছে, যা জীব-উদ্ভিদ বৈচিত্র্যে ফাটল ধরাচ্ছে ও ভূমিক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে পলি অবক্ষেপণ বাড়িয়ে পরোক্ষভাবে ভূমির নিম্নমানের হার বৃদ্ধি করে চলেছে।

আর্সেনিক দূষণ : ভু-গর্ভস্থ পানির অত্যধিক আহরণে জেলায় আর্সেনিক দূষণ ক্রমশ বাড়ছে। তাই নিরাপদ পানির সংকট দিনদিন তীব্রতর হচ্ছে।

জলবায়ুর পরিবর্তন : জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে জেলার পেশাজীবী শ্রেণীর জীবন ও জীবিকায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অনাকাঙ্ক্ষিত এই জলবায়ুর পরিবর্তন একদিকে যেমন ক্ষুদ্র কৃষক ও জেলেদের জীবনে "আয়ের নিরাপত্তাহীনতা"কে তীব্রতর করে তুলছে, অন্যদিকে তেমনি নারী মজুরি-শ্রমিক ও গৃহিণীদের "সম্পদ ও

নিরাপত্তা"কে সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। অসময়ে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে গ্রামাঞ্চলের নারীরা বিল এলাকায় জ্বালানি (বিশেষত গোবর, কাঠ, খড়) সংগ্রহের জন্য বের হতে পারে না এবং শহরে বহু নারী শ্রমিককে ঘরে বসে থাকতে হয়। জাহাজের তেল নিঃসরণ, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদী ভরাট ও সম্পদের অবৈধ ব্যবহার সমগ্র সুন্দরবন এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। সমগ্র বাংলাদেশের জলবায়ু অনেকাংশেই সুন্দরবন এলাকার আবহাওয়ার সাথে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। আর তাই, সুন্দরবনের আবহাওয়া পরিবর্তন সমগ্র দেশকে আক্রান্ত করবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

সম্ভাব্য প্রতিবেশগত সমস্যা

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র : পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব প্রতিরোধের প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে দু'দেশের উচ্চ মহলে আলোচনা ও সমঝোতা আনা অতি জরুরি। স্থানীয় পর্যায়ে এই বিষয়ের উপর জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালানো প্রয়োজন। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য বিঘ্নিত হবার আশংকা বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণই সরকারি পর্যায়ে জোরালো আবেদন জানাতে পারে।

সুন্দরবন এলাকায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান : পরিবেশবাদীদের মতে, সুন্দরবন এলাকায় তেল-গ্যাসের অনুসন্ধানী কার্যক্রম সুন্দরবনের পরিবেশকে অল্প সময়ের মধ্যে বিনষ্ট করবে। কেননা, জ্বালানী উদগিরণ ও খনন কালে উচ্চ মাত্রার শব্দ দূষণ এবং হাইড্রোকার্বন থেকে বনাঞ্চলের মাটি দূষিত হয়ে পড়বে। এতে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক আবাসভূমির পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। ভূতত্ত্ববিদ ও দুর্যোগ বিশারদদের মতে, তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন উভয়ই উপকূলীয় অঞ্চলকে নিম্ন ভূমিকম্প ঝুঁকির এলাকা থেকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পরিণত করতে পারে। এই বিতর্কিত উদ্যোগ বাস্তবায়নের বিষয়টি সমঝোতাপূর্ণ নিষ্পত্তি প্রয়োজন। উল্লেখ্য, বন আইন ১৯২৭ অনুসারে বনের সংরক্ষিত এলাকা থেকে ২০ কি.মি.-র মধ্যে একমাত্র বনায়ন ছাড়া কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা নেয়া নিষিদ্ধ ও ২০০১ সালে সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী ৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে নাজুক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক সমস্যা

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : খুলনার নাগরিক জীবনের একটি সমস্যা হল দৈনন্দিন বর্জ্য বা ময়লা অপসারণ। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, দৈনিক প্রতিটি গৃহ থেকে প্রায় ০.২ কেজি পরিমাণ বর্জ্য ঘরের বাইরে নির্ধারিত বা অনির্ধারিত স্থানে ফেলা হয়। খুলনা সিটি করপোরেশন (কেসিসি) এই বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত। কেসিসি প্রতিদিন প্রায় ১২০ টন বর্জ্য অপসারণ করে থাকে আর বাদ বাকি ১২০-১৪০ টন বর্জ্য/আবর্জনা রাস্তার ধারে, ড্রেনে, নালায় বা ডাস্টবিনে স্তূপাকারে পড়ে থাকে। এই আবর্জনা শহরের বন্যা, যানজট বা পরিবেশ দূষণই কেবল করে না, বরং, স্থানীয় সমাজের জন্য এটি বিরাট স্বাস্থ্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুলনা শহরের ক্রমবর্ধনশীল জনসংখ্যার চাপে এই সমস্যাও দিন দিন প্রকট হচ্ছে। উল্লেখ্য, কেসিসির পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও কম্যুনিটি সংগঠন ও ক্লাবের উদ্যোগে এই আবর্জনা অপসারণ ও নগর দূষণ প্রতিরোধের চেষ্টা চলছে। এ ছাড়া "বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প"-র আওতায় ও স্থানীয় এনজিও প্রদীপণের উদ্যোগে বর্জ্যের প্রাথমিক সংগ্রহের বিষয়টি শহরে ব্যাপক সাড়া ফেলে। বর্তমানে নাগরিক উদ্যোগে এটির ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক, পরিচ্ছন্ন নাগরিক জীবনের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অতি জরুরি।

ভূমি ব্যবস্থাপনা : খাস জমি বন্দোবস্ত, চিংড়ি ঘেরের জমি দখল ঘেরে লোনা পানির অনুপ্রবেশ ইত্যাদি কারণে জেলার ভূমি ব্যবস্থাপনায় সংকট দেখা দিয়েছে। প্রশাসনের সহযোগিতায় ও মাস্তানদের দৌরাত্ম্যে বহু জমি চিংড়ি ঘেরের জন্য লিজ দেয়া হচ্ছে। আশপাশের ধানী জমির সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি তোয়াক্কা না করে মাছের ঘেরে লোনা পানি ঢুকিয়ে অবাধে চিংড়ি চাষ হচ্ছে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি : গোটা সুন্দরবন এলাকা এবং গভীর সমুদ্র বনদস্যু ও জলদস্যুদের অভয়াশ্রমে পরিণত হয়েছে। বনদস্যুদের ভয়াবহ দৌরাত্ম্যের কারণে সুন্দরবনের বনজ সম্পদ আহরণের মৌসুমে বাওয়ালী ও তাদের মহাজনরা গহীন বনে যেতে পারে না। প্রতি বছর গোলপাতা ও অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণের মৌসুম আসলেই বনদস্যুরা বেশি তৎপর হয়ে উঠে। তারা বাওয়ালী ও মহাজনদের কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে। অন্যথায় বাওয়ালী ও নৌকা জিম্মি করে চাঁদা আদায় করে। আগে যেখানে নৌকা প্রতি ১-২ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হতো, সেখানে নৌকা প্রতি চাঁদার পরিমাণ বর্তমানে নিদেনপক্ষে ৫ হাজার টাকা। অন্যদিকে জেলেদের মাছ ধরা ট্রলার ও নৌকা থেকে মাছ, জাল, ডিজেলসহ টাকা পয়সা লুট নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনীর পর্যাপ্ত টহল না থাকার কারণে গভীর সমুদ্রে বনদস্যুরা সংঘবদ্ধভাবে রামদা, কুড়াল ও লাঠিসোঁটা নিয়ে সমুদ্রগামী জেলেদের উপর ঝাঁপিয়ে পরে। এভাবে জান ও মালের নিরাপত্তার অভাবে সুন্দরবনের সমুদ্র উপকূল ও গভীর সমুদ্র থেকে জেলেরা মাছ না ধরেই ঘরে ফিরে আসে। জলদস্যুদের এই অপতৎপরতা প্রত্যক্ষভাবে দেশের রাজস্ব আয় ও জেলেদের জীবিকা নির্বাহে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। উল্লেখ্য, মুক্তিপণের দাবিতে অপহরণ সুন্দবনের একটি অতিপরিচিত ঘটনা।

শিল্প দূষণ : পরিবেশগত বিপর্যয়ের আশংকাকে বাড়িয়ে চলেছে শিল্প দূষণ। শিল্প কারখানা স্থাপন, ফ্যাক্টরি বা মিল থেকে বর্জ্য পদার্থ নিঃসরণের ফলে সৃষ্ট শিল্প দূষণ খুলনা জেলাকে দূষিত "হট স্পটে" পরিণত করেছে। অর্থাৎ, বাংলাদেশের ছয়টি হট স্পটের মধ্যে খুলনা জেলা একটি। খুলনা নৌবন্দর ও মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার তরল বর্জ্য নদী-নালার পানিকে দূষিত করে তুলছে। রূপসা শিল্প এলাকার কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান ও দেয়াশলাই কারখানার বর্জ্য রূপসা নদী দূষণের অন্যতম কারণ। এ ছাড়া খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল, হার্ডবোর্ড মিল, গোয়ালপাড়া থারমাল শক্তি স্টেশন আর খালিশপুরের পাট ও লৌহ কারখানার বর্জ্যে ভৈরব নদীর পানি দূষিত হয়ে পড়ছে। উল্লেখ্য, খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল থেকে এক সময় ভৈরব নদীতে ঘন্টায় ৪৫০০ কিউবিক মিটার বর্জ্য পানি নিষ্কাশন হতো। যার মধ্যে ভারী যৌগের উপস্থিতি নদী দূষণকে ভয়াবহ করে তোলে। মাছের ঘেরে সার, রাসায়নিক পদার্থ ও এ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার ঘের এলাকার পার্শ্ববর্তী খাল-নালার পানিকে দূষিত করছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, খুলনা জেলার ভূ-গর্ভস্থ পানিতে দ্রবণীয় বর্জ্যের মাত্রার পরিমাণ সারা দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি।

নগর দূষণ : খুলনা জেলায় নগর দূষণ একটি অন্যতম সমস্যা। অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, অপরিকল্পিত এবং অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন, শিল্পায়ন, যানবাহনের কালো ধোঁয়া, উচ্চশব্দযুক্ত হর্ন, পৌর আবর্জনা ব্যবস্থাপনার অভাব, জ্বালানি সংকট, ইটের ভাটা ও তার ধোঁয়া, অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট নির্মাণ করা নগর দূষণের অত্যতম কারণ। জেলার চিংড়ি ঘের ও লবণের মাঠগুলো নদী-নালা ও খালের পানি দূষিত করছে। শহরের ড্রেন ও নালায় বর্জ্য নিক্ষেপ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

দারিদ্র্য : জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি, যথাযথ কাজের অভাব ও স্বল্প মজুরি জেলার দারিদ্র্য দশাকে জোরালো করে তুলছে। দ্রুত নগরায়ন সত্ত্বেও জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি বর্তমানে একটি প্রধান সমস্যা বলে বিবেচিত। যদিও শিল্প সম্ভাবনা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যেমন, অবকাঠামো, শিক্ষা, চিকিৎসাসেবা ইত্যাদির বিচারে খুলনা জেলা অনেক এগিয়ে আছে, তবু জেলার দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের উপযুক্ত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

বনদস্যুদের প্রভাব : সুন্দরবন, উপকূল এলাকা ও গহিন সমুদ্রে বনদস্যু ও জলদস্যুদের দৌরাত্ম্য, নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটতে না পারলে চলতি অর্থবছরে সামুদ্রিক মৎস্যখাতে রাজস্ব আয় অর্ধেকে নেমে আসতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। সেই সাথে অসংখ্য জেলে বেকার হয়ে যাবার সম্ভাবনাও প্রবল।

বাগদা চাষ : অপরিকল্পিত বাগদা চাষ জেলার পরিবেশগত বিপন্নতা বাড়িয়ে তুলছে। কেননা, চিংড়ি চাষের কারণে মাটির লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এক সমীক্ষায় জানা যায়, গত বিশ বছরে জেলার ফসল উৎপাদন অনেক কমে গেছে।

বাণিজ্য সংকট : সরকার আধা নিবিড় চিংড়ি চাষকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা দিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থাকে (বিসিক) এর সম্প্রসারণের দায়িত্ব দিয়েছে। ফলে এই জেলায় চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও বাণিজ্য সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। একই সাথে চিংড়ি ঘেরে ভাইরাসের আক্রমণ, অবৈধ ঘের, ঘের দখল, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, ফসল নষ্ট, রেণু পোনা নষ্ট, চিংড়ি শিল্পের ক্ষতিকর প্রভাব হিসেবে বিবেচিত।

চিংড়ি পোনা ধরা : চিংড়ি পোনা ধরার কারণে বহু মূল্যবান প্রজাতির মাছের পোনা ধ্বংস হচ্ছে। চিংড়ি পোনা ধরার ক্ষেত্রে আইনী হস্তক্ষেপ ও জনসচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি : নগরীর রূপসা ফেরিঘাট এলাকার দুই তীরেই সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের অপতৎপরতা লক্ষণীয়। এক শ্রেণীর অসাধু লোকদের হাতে রূপসা ফেরি পারাপারের যাত্রীরা জিম্মি হয়ে আছে। চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, হুমকি, ছিনতাই ইত্যাদি সেখানের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। রূপসা সেতু এই সমস্যার সমাধানে সহায়তা করবে, তবে জেলার পুলিশ ও প্রশাসনের কঠোর হস্তক্ষেপও থাকা জরুরি।

বিপদাপন্নতা : বিপদাপন্নতা সমীক্ষা (সিইজিআইএস, ২০০৩)-তে জেলার প্রধান জীবিকা প্রধানত প্রাকৃতিক, ভৌত ও সামাজিক বিপদাপন্নতার শিকার। এর ফলে জেলে, ক্ষুদ্র কৃষক, চিংড়ি চাষী ও মজুরদের জীবন ও জীবিকায় নিরাপত্তাহীনতা প্রকট হয়ে উঠছে।

পর্যটন বিষয়ক সমস্যা

উপযুক্ত অবকাঠামো অভাব : সুন্দরবন ও খুলনার ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোতে পর্যটন শিল্প বিকাশের অন্তরায় হল উপযুক্ত অবকাশ কেন্দ্র ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব। সরকারি ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা গেলে পর্যটন শিল্প বিকশিত হবে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা : সুন্দরবনের ভেতরে বা গহিনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। কেবলমাত্র নৌ-পথেই সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলোতে পৌঁছানো সম্ভব; আর নৌ-পথে নানাধরনের বিড়ম্বনা বা বিপদ/ আশংকায়পূর্ণ। সুন্দরবনের পর্যটন আকর্ষণকে বিকশিত করতে সর্বপ্রথমে নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি।

পর্যটন গাইড : জেলায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সচেতন পর্যটন গাইডের সংখ্যা নগণ্য। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের উদ্যোগে পর্যাপ্তসংখ্যক গাইড নিয়োগ করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

যোগাযোগ

অবকাঠামো উন্নয়ন : শহরের রাস্তা-ঘাট, বন্দর ও পুরান নৌঘাটগুলোর অবস্থা শোচনীয়। সংস্কারের অভাব ও মাস্তানদের দৌরাত্ম্যের কারণে জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে।

সেতু/ব্রিজ নির্মাণ : প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, দীর্ঘসূত্রতা আর স্থানীয় চাঁদাবাজদের হুমকির মুখে জেলার প্রধান দু'টি সেতু (রূপসা ও বটিয়াঘাটা) নির্মাণের কাজ পিছিয়ে পড়েছে। বটিয়াঘাটা সেতু নির্মাণের কাজ পরিত্যক্ত ঘোষিত হবার আশংকা দেখা দিয়েছে।

তেল-গ্যাস সম্পদ রক্ষা ও বিপন্ন সুন্দরবনকে বাঁচানোর দাবি

খুলনা অঞ্চলে কাঁকড়া রফতানি নিয়ে সংকট সৃষ্টি হতে পারে

Shrimp sector awaits big boost

বনজসম্পদ রক্ষায় আরও সচেতন ও সক্রিয় হোন

বন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গলের সংখ্যা বেড়ে এখন চারশ'

খুলনা মহানগরী উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে কেডিএ-কেসিসি টানাপড়েন

জাতীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত

সুন্দরবন : পর্যটন কেন্দ্র গড়ার উদ্যোগ নেই

চিংড়ি রফতানি আয় ১০ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করা হবে

নিজেদের ব্যাংক নিজেরাই গড়েছেন ফুলতলার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা

সম্ভাবনা ও সুযোগ

সুন্দরবন, জলাভূমি, মোহনা আর মানব সম্পদের দিক থেকে খুলনা জেলা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং অপার সম্ভাবনাময় জেলা। জেলা ও মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের জনমানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের (২০০৩) মাধ্যমে জেলার প্রধান সম্ভাবনাময় দিকগুলোর স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনউদ্যোগের কয়েকটি সম্ভাবনাময় দিক এখানে আলোচিত হল।

প্রাকৃতিক সম্পদ

সুন্দরবন : সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের একটি উপযুক্ত সমীক্ষা হওয়া দরকার। এতে সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবস্থাপনার দুয়ার খুলে যাবে। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে এটি করা যেতে পারে।

উদ্ভিদ ও জীববৈচিত্র্য : সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ "বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান" রক্ষায় একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। কেননা মানুষের জন্য অনাহূত এই সুন্দরবনের উদ্ভিদ ও জীববৈচিত্র্য পর্যটন শিল্প ও ইকোসিস্টেম রক্ষায় সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে। তাই, জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পাগমার্ক জরিপ পদ্ধতিতে বাঘশুমারি, কুমির অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা, রোগাক্রান্ত সুন্দরী গাছ কেটে ফেলা কয়টি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

সুন্দরবনের মধু : প্রতি বছর সুন্দরবন থেকেই প্রায় দুই লাখ লিটার মধু উৎপাদিত হয়। দেশে এবং বিদেশে সুন্দরবনের মধুর ব্যাপক চাহিদা আছে। তাই, মধু উৎপাদন নিশ্চয়তা করতে অবৈধ উপায়ে মধু আহরণ এবং বন উজাড় বন্ধ করতে হবে।

আন্তঃসীমান্ত শান্তি পার্ক : সুন্দরবনের বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তে মূল্যবান জীব প্রজাতি যেমন, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সঠিক গণনা নিশ্চিত করতে ও শিকার প্রতিরোধে আন্তঃসীমান্ত শান্তি পার্ক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাটি সম্ভাবনাময়। উল্লেখ্য, এর আশু বাস্তবায়নে দুই দেশের উচ্চপর্যায়ে বৈঠক ও আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

জলাভূমি : জেলার জলাভূমি সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

চরাঞ্চল : খুলনা জেলার মূল ভূ-খণ্ডের সাথে সংযুক্ত সব কয়টি চরে পরিকল্পিত উপায়ে মাছের চাষ, নিবিড় বাগদা চাষ, গো-চারণ, কৃষি ও লবণ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ
- সুন্দরবন
- উদ্ভিদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
- সুন্দরবনের মধু
- আন্তঃসীমান্ত শান্তি পার্ক
- জলাভূমি
- মোহনা, নদী ও বিলের মাছ
- খনিজ
- চরাঞ্চল

কৃষি ও অর্থনীতি
- চিংড়ি চাষ
- ধানক্ষেতে মাছ চাষ
- ঘেরের আইলে সবজি চাষ
- হ্যাচারি
- মৎস্য অভয়ারণ্য
- কাঁকড়া চাষ
- লবণ চাষ
- জোয়ার-ভাটার মাধ্যমে নদী ব্যবস্থাপনা

শিল্প ও বাণিজ্য
- নগরায়ন
- ব্যক্তিখাত
- শিল্পাঞ্চল
- লবণ শিল্প
- শুঁটকি
- পুনরুৎপাদন শক্তি উৎপাদন
- গ্যাসনির্ভর বিদ্যুৎ

আর্থ-সামাজিক
- বাঁধ সংরক্ষণ
- ভূমি ব্যবহার
- বাওয়ালী ও মৌয়ালীদের জীবনবীমা
- কার্যক্রম

পর্যটন শিল্প
- বিশ্ব ঐতিহ্য
- প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন
- বন্যপ্রাণীর অভয়াশ্রম

যোগাযোগ
- ব্রিজ বা সেতু
- নৌ-রেল যোগাযোগ

মোহনা, নদী-বিলের মাছ : উপকূলের উপরের ও গভীর স্তরের মাছ, অপ্রচলিত মাছ, মোহনা, নদী-বিলের সাদা মাছের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। যথাযথ আইন প্রয়োগ, জেলেদের সুবিধা প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধি ও জলদস্যুদের প্রতিরোধের মাধ্যমে উপকূলে মাছের প্রজাতি রক্ষা ও বাণিজ্যিক আহরণ করা সম্ভব। উন্নত প্রযুক্তি ও মাছ ধরার শক্তিশালী জেলে নৌকা (লঞ্চ) ঋণের মাধ্যমে জেলেদের দিতে হবে। যার ফলে সুন্দরবনের জেলেরা গভীর সাগরের অফুরন্ত মাছ ধরবে এবং অগভীর সাগরের উপর চাপ কমবে এবং মাছের পোনা রক্ষা পেয়ে গভীর সাগরের মাছ উৎপাদন বাড়বে। শুধু তাই নয়, সচেতনতা সৃষ্টিতে জেলেদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

খনিজ সম্পদ : জেলার খনিজ সম্পদের (পীট কয়লা, তেল, গ্যাস) মোট পরিমাণ নির্ণয় করা দরকার। উপযুক্ত উপায়ে এসব খনিজ পদার্থ উত্তোলন করতে পারলে দেশের চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সহজ হবে।

কৃষি ও অর্থনীতি

চিংড়ি চাষ : চিংড়ি চাষ, উৎপাদনের পরিমাণ ও রফতানিতে খুলনা দেশের অন্যতম পথিকৃৎ। তাই নিবিড় ও পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষের প্রাথমিক পর্যায় অর্থাৎ হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন থেকে শুরু করে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এতে মানসম্মত চিংড়ি উৎপাদন ও রফতানি নিশ্চিত হবে ও আন্তর্জাতিক বাজারে এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে, দেশের অর্থনীতি জোরদার হবে।

চিংড়ি ঘেরের আইলে সবজি চাষ : খুলনা জেলায় চিংড়িচাষীরা ঘেরের আইলে সবজি চাষের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কেননা এতে ঘেরের আয় বেড়ে দ্বিগুণ হয়।

ধান ক্ষেতে মাছ চাষ : খুলনায় ধান ক্ষেতে মাছ চাষ থেকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা নিশ্চিত করা গেলে কৃষকরা এই উৎপাদনমুখী চাষ পদ্ধতিতে আরো আগ্রহী হয়ে উঠবে।

হ্যাচারি : জেলায় আরো কয়টি হ্যাচারি স্থাপন করা হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি মানের চিংড়ি চাষীরা স্বল্প মূল্যে চিংড়ি পোনা কিনতে পারবে। অন্যদিকে কক্সবাজার থেকে চিংড়ি পোনা পরিবহনের খরচ কমবে। এতে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জাতীয় আয় ও জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে। এ ছাড়া এটি সাগরের পোনা ও অন্যান্য মাছের প্রজাতি রক্ষায় সহায়তা করবে পরোক্ষভাবে।

মৎস্য অভয়ারণ্য : চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, ১৯৯৯ (মৎস্য অধিদফতর)-এর তথ্য অনুসারে, সমগ্র খুলনা জেলার মোট পাঁচটি উপজেলায় মোট ৬১০০ হেঃ এলাকায় মৎস্য অভয়ারণ্য স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে খাল-বিল ও নদীর নির্দিষ্ট অংশে মাছ না ধরার স্থানীয় চর্চার সাথে মৎস্য অভয়ারণ্য স্থাপনের উদ্যোগ জেলার মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে নিঃসন্দেহে। এতে স্থানীয় ও দেশের চাহিদা পূরণ ছাড়াও মৎস্য খাতে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে।

কাঁকড়া চাষ : সুন্দরবন উপকূলে কাঁকড়া/Mud crab চাষ করা সম্ভব। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও বিজ্ঞানসম্মত কৌশল অবলম্বনে কাঁকড়া চাষের বিকাশ ঘটানো সম্ভব। এতে দরিদ্র জনসাধারণের কর্মসংস্থান ও আয়ের পথ খুলে যাবে।

জোয়ার-ভাটার মাধ্যমে নদী ব্যবস্থাপনা : জোয়ার-ভাটার মাধ্যমে নদী ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ Tidal River Management (TRM) খুলনায় বিল ডাকাতিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করলেও বিল ভায়না ও বিল কেদারিয়ায় এর সফল বাস্তবায়ন ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। আর তাই সমগ্র খুলনা জেলাসহ সুন্দরবনের এলাকা জলাবদ্ধতা নিরসনে TRM-এর সফল বাস্তবায়নের সম্ভাবনা প্রবল।

মূলত জোয়ার-ভাটার নদীতে জোয়ারের পরিমাণ কমে গেলে তার আয়তনও কমে যায়। তাই, এক সময় খুলনা-যশোর এলাকায় ছোট ছোট নিম্নভূমিতে জোয়ারের পানি প্রবেশ করিয়ে নদী-নালার নাব্যতা নিশ্চিত করা হতো এবং পলি জমে সেই নিম্নভূমি উঁচু হতো। এটিই TRM জোয়ার-ভাটার মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা বলে পরিচিত। TRM-এর মাধ্যমে নদীর নাব্যতা ও জলাবদ্ধতার নিরসন সম্ভব।

আর্থ-সামাজিক

বাঁধ সংরক্ষণ : বাঁধ সংরক্ষণে বাস্তব, সময়োচিত উদ্যোগ ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। ভাঙন রোধ, লোনাজলের প্রবেশ গতিরোধ, ফসল রক্ষা, শহর ও গ্রামাঞ্চল রক্ষায় সরকার ও স্থানীয় জনসাধারণের ঐকান্তিক সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন।

ভূমি ব্যবহার : স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণে জেলার ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা তৈরি করা দরকার। এতে করে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

বাওয়ালী ও মৌয়ালীদের জীবনবীমা কার্যক্রম : সুন্দরবনের এই স্বতন্ত্র ধারার জীবিকা গোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা প্রদানের ক্ষেত্রে জীবনবীমা কার্যক্রম চালু করা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এর ফলে, তাদের সচেতনতা সৃষ্টিসহ সঠিক উপায়ে বনজ সম্পদ আহরণের পথ প্রশস্ত হবে। উল্লেখ্য, এই ধরনের জীবনবীমা কার্যক্রম চিংড়ি পোনা সংগ্রহকারী ও জেলেদের জন্যও চালু করা যেতে পারে।

শিল্প ও বাণিজ্য

নগরায়ন : জেলার কৃষি ও অর্থনীতির বিকাশে নগরায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। খুলনা শহরে বড় বড় কল-কারখানা গড়ে ওঠার পেছনে নগরায়নের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। একযোগে বিদ্যুৎ, পানি, রেল-নৌ-সড়ক যোগাযোগের সুবিধা জেলার কৃষি ও অর্থনীতিতে সাফল্য বয়ে আসছে। এর ধারাবাহিকতা রক্ষায় জেলায় নগরায়নের বিস্তৃতি ও খুলনা শহরের আধুনিকায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

ব্যক্তিখাত : জেলায় গত ২০ বছরে ব্যক্তিখাতের কার্যকলাপ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। চিংড়ি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রফতানি এবং পর্যটন শিল্পে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ জেলার অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়তা করবে।

শিল্পাঞ্চল : প্রতিটি উপজেলায় শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে পারলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে; অন্যদিকে উৎপাদন বাড়বে।

লবণ শিল্প : কয়রা উপজেলার কপোতাক্ষ নদীর তীরবর্তী প্রায় ৫০ বছরের পুরানো বাঘালির চর এবং দাশলিয়া চরে লবণ চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে এই উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের ১ লাখ একর জমি ধান চাষের পর লবণ চাষের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। আর তাই এক ফসলি জমিগুলো দো-ফসলি জমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। তবে লাভজনক এই পেশার বিস্তৃতির জন্য লবণ বিশুদ্ধকরণ ও বাজারজাতকরণের সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

শুঁটকি : যথাযথ আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে এই জেলায় শুঁটকি শিল্পের বিকাশ ঘটানো সম্ভব এবং এর থেকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবার সম্ভাবনাও প্রবল। চরাঞ্চলে স্বল্প দামের "সোলার টানেল ড্রায়ার" পদ্ধতিতে পুষ্টি ও গুণগত দিক থেকে উন্নতমানের শুঁটকি তৈরি করা সম্ভব।

পুনরুৎপাদনযোগ্য শক্তি উৎপাদন : জেলার স্লুইস গেটগুলোতে জোয়ারের গতি বা প্রবল স্রোতকে কাজে লাগিয়ে পুনরুৎপাদন শক্তি (Renewable Energy) উৎপাদন করা সম্ভব।

গ্যাসনির্ভর বিদ্যুৎ : খুলনায় গ্যাসনির্ভর শক্তি কেন্দ্র (Gas based Power Plant) স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এর **ফলে** প্রায় ৯৩ মাইল দীর্ঘ পাইপলাইন স্থাপন করা হবে **ও** বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ সম্ভব হবে।

পর্যটন শিল্প

সুন্দরবন : সুন্দরবনের নৈসর্গিক শোভা, জীব-উদ্ভিদ বৈচিত্র্য পর্যটন শিল্প বিকাশের সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে এবং প্রকৃতিকে উপভোগ করেই এখানে ইকো-ট্যুরিজম-এর ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

দর্শনীয় স্থান : জেলার শহর ও গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য দর্শনীয় স্থান রয়েছে। ঐতিহ্যনির্ভর এই স্থানগুলোকে কেন্দ্র করে জেলায় পর্যটন আকর্ষণ গড়ে তোলা সম্ভব। জেলার দর্শনীয় স্থানগুলোতে পর্যাপ্তসংখ্যক হোটেল বা অবকাশযাপন কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত "পর্যটন গাইড" নিয়োগ করলে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের সমাগম হবে এবং আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যাবে।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন : জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনকে ঘিরে পর্যটন কর্মসূচি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। কেননা জেলা সৃষ্টির শুরু থেকেই এটি নানা শাসক ও রাজ্যের অধীনে থাকার কারণে এর পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাস অত্যন্ত বর্ণময়। আর তাই ঐতিহাসিক স্থান ও পুরাকীর্তিগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্যও অপরিসীম।

যোগাযোগ

ব্রিজ বা সেতু নির্মাণ : জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্রিজ বা সেতু নির্মাণ একটি যথোপযুক্ত উদ্যোগ। সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম সংযোজন "রূপসা সেতু" নির্মাণ, খুলনা-দাকোপ সড়কের শৈলমারী নদীর উপর অ্যাপ্রোচ রোডসহ বটিয়াঘাটা ব্রিজ নির্মাণ এর অন্যতম উদাহরণ।

নৌ-রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন : নদী বন্দরগুলোর উন্নয়ন ও সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপনের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, যাতায়াতের উন্নয়ন ও আঞ্চলিক দূরত্ব কমে গেছে।

ভবিষ্যতের রূপরেখা

খুলনার বর্তমান জনসংখ্যা ২৩.৫৭ লাখ থেকে আগামী ২০১৫ সালে হবে ২৮.৯১ লাখ এবং ২০৫০ সালে ৪১.২৬ লাখ। মাত্র ১৫ বছরে লোকসংখ্যা বাড়বে ৫.৩৪ লাখ। ২০১৫ সালে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের শেষ বছর। খুলনা জেলার জনসংখ্যার ৫২% পুরুষ এবং ৪৮% নারী আর ৪৭% গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এবং ৫৩% শহুরে জনগোষ্ঠী।

এই বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য এবং জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের নানান পথ তৈরি করতে হবে। জেলার উন্নয়নে যে সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যায় তা হল পর্যটন সম্ভাবনা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি। অন্যদিকে যে সব বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেয়া দরকার তা হল জলাবদ্ধতা নিরসন, পানি ব্যবস্থাপনা, মাটি-পানির লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ, আপদকালীন নিরাপত্তা - পর্যাপ্ত বিপদ সংকেত, নদী শাসন, সুন্দরী গাছের আগামরা রোগ, জীব-প্রজাতি হ্রাস, নগর ও শিল্প দূষণ, পর্যটন শিল্প, নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি।

অতিসম্প্রতি সরকারের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সাথে আই.ইউ.সি.এন-এর এক সংলাপ অনুষ্ঠানে বলা হয়, সরকার যথাযথ সহায়তা দিলে আগামী ২০০৮ সাল নাগাদ চিংড়ি রফতানি থেকে বর্তমানের তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি রফতানি আয় করা সম্ভব। এরই সূত্র ধরে আরো বলা হয়, দেশের চিংড়ি চাষে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে মানসম্পন্ন পরিবেশবান্ধব ও সামাজিকভাবে অনুকূল চিংড়ি চাষ প্রক্রিয়ার প্রচারণা ও চর্চা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, অন্যতম চিংড়ি উৎপাদনকারী জেলা হিসেবে খুলনায় এর যথার্থ প্রয়োগের প্রয়োজন রয়েছে।

সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে জেলার সম্ভাবনার বিষয়টির যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে পর্যটন সম্ভাবনা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনজ সম্পদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। উল্লেখ্য, আন্তঃসীমান্ত শান্তি পার্ক বাস্তবায়নের ফলে মূল্যবান জীব-প্রজাতির সঠিক গণনা নিশ্চিত করা ও সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। বাওয়ালী ও মৌয়ালীদের জীবনবীমা কার্যক্রম সঠিক উপায়ে বনজ সম্পদ আহরণের সুযোগ নিশ্চিত করবে ।

দক্ষিণাঞ্চলের সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচনে রূপসা সেতু ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। রূপসা সেতু নির্মাণে নদী দূষণ যেমন কমবে, তেমনি নৌপথে সুন্দরবনের মূল্যবান সম্পদের চোরচালানি বন্ধ হবে। রূপসার তীরে জনগণের নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণসহ পর্যটন শিল্প সম্ভাবনা বিকাশে সাহায্য করবে। এতে করে সুন্দরবন ও বাগেরহাট হযরত খানজাহান আলীর পুরাকীর্তিসমূহে পর্যটন আকর্ষণ বাড়ানো সম্ভব হবে। যেহেতু সুন্দরবন এলাকা দেশের স্থল যোগাযোগ নেটওয়ার্কের বাইরে অবস্থিত, তাই রূপসা সেতুর মাধ্যমে বাগেরহাট শহর ও খুলনা থেকে মংলা বন্দরের মধ্য দিয়ে সুন্দরবন পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হবে। নিত্য-নৈমিত্তিক দুর্ভোগ, দুর্ঘটনা আর অনিশ্চয়তার হাত থেকে মানুষ রেহাই পাবে।

জেলার কল-কারখানাগুলোর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে। যে কারণে জেলার ঐতিহ্যবাহী শিল্প-কারখানাগুলো আজ নানা ধরনের অনিয়ম ও জটিলতার শিকার, সেটি যাচাই করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ফলে জেলার শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

যেহেতু জেলার অধিকাংশ জনগণ নগরবাসী, তাই নগরায়নের বিকাশে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। দূষণমুক্ত খুলনা নগরীতে পর্যটক ও শিল্প উদ্যোক্তাদের ভিড় বাড়বে।

মানবসম্পদের উন্নয়নে জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। আর তাই জেলার বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি কলেজ ও মেডিকেল কলেজে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ও সার্বিক মান উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

এ ছাড়া জেলার সামগ্রিক উন্নয়নে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেয়া প্রয়োজন। এতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানুষের নিজেদের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির হার কমে যাবে।

জেলার ১৪টি উপজেলায় ১৪টি শিল্পাঞ্চল করা যেতে পারে। শিল্পাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানায় জেলায় প্রাপ্ত কাঁচামাল যেমন, মাছ, কাঠ, অন্যান্য সামুদ্রিক কাঁচামাল, কৃষিপণ্য ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে, রাস্তা-ঘাট, বন্দর, বিদ্যুৎ, যোগাযোগসহ নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। বাজারকে লক্ষ্য রেখে এখানে একটি ইপিজেড স্থাপন করা যেতে পারে। এ সব ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাই নিশ্চিত করে উপজেলার প্রবাসী ব্যাক্তিবর্গকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা সম্ভব। উপজেলার প্রবাসী বাংলাদেশীরা একদিকে যেমন বিনিয়োগ করতে পারবে অন্যদিকে প্রবাসে থাকার কারণে রফতানিতে ভূমিকা রাখতে পারবে। বস্তুত, সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে এই উদ্যোগ অর্থনীতিতে বিরাট সাফল্য নিয়ে আসবে।

দর্শনীয় স্থান

খুলনা জেলা মংলা সমুদ্র বন্দর ও সুন্দরবনে প্রবেশের স্বর্ণদ্বার হিসেবে বিবেচিত। খুলনার ঐতিহাসিক ও পুরাকীর্তির নিদর্শনগুলো আজ প্রাকৃতিক ও মানুষের কারণে ব্যাপক হুমকির সম্মুখীন। খুলনার লবণাক্ত প্রতিবেশে ইটের তৈরি এ সব প্রাচীন স্থাপত্যের যথাযথ সংরক্ষণে প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত উদ্যোগ ও কারিগরি সহায়তা।

সুন্দরবন : নৌপথে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বন/সংরক্ষিত বনাঞ্চল, বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য, গভীর বনে চিত্রা হরিণের অবাধ বিচরণ, বাঘের পদচারণা, জলাভূমির পাখ-পাখালি, ম্যানগ্রোভ গাছের সারি মোহনায় ও ডলফিনের বিচরণসহ অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করা যায়।

টোল চতুষ্পাঠী : সংস্কৃত চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র টোল চতুষ্পাঠীর অন্যতম উদাহরণ হল কেশব চন্দ্র বিদ্যা মন্দির। এটি খুলনার সাউথ সেন্ট্রাল রোড ও হাজী মুহসীন রোডের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ফকিরহাট থানার শ্রী মাধব চন্দ্র চক্রবর্তী ১৯৩৫ সালে প্রাচীন মন্দিরের স্থাপত্যকলার এই যথার্থ নিদর্শনটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই টোলটি তৎকালীন সময়ে খুলনার সংস্কৃত পঠন-পাঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই টোলটি দৌলতপুরের সরস্বতী চতুষ্পাঠীর মত বন্ধ হয়ে যায়নি। এখনও এই টোলটি চালু রয়েছে এবং প্রাচীন রীতির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজটি চলছে। এই টোলটি খুলনাঞ্চলে তথা সমগ্র বাংলাদেশে সংস্কৃত চর্চার নিদর্শন বহন করে চলেছে। আর তাই এই টোলের প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

দক্ষিণ ডিহি : দক্ষিণডিহি রবীন্দ্র কমপ্লেক্স খুলনার একটি সদ্যভূমিষ্ঠ জাদুঘর ধরনের প্রতিষ্ঠান। ফুলতলা উপজেলার তীর্থ নদ ভৈরবের কোলঘেঁষা এই দক্ষিণ ডিহিই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মামার বাড়ী ও শ্বশুরবাড়ি। এখানেই ১৮৮৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর অর্থাৎ বাংলা ১২৯০ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সেরেস্তার কর্মচারী বেনী মাধবের কন্যা মৃনালিনী দেবীর সাথে কবিগুরুর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের সাহিত্য অনুরাগী - সংস্কৃতিপ্রেমী জনগণের কাছে এর অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৯৫ সালে এখানে "রবীন্দ্র কমপ্লেক্স" নামে একটি পর্যটন কেন্দ্র গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এর কর্ম পরিকল্পনার আওতায় একটি রবীন্দ্র সংগ্রহশালা, পাকা রাস্তা নির্মাণ ও রবীন্দ্র ইনস্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। ১৯৯৫ সালে সরকারি সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত রবীন্দ্র কমপ্লেক্স-এর যথাযথ বাস্তবায়নে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি সঠিকভাবে সংরক্ষণ সম্ভব হবে।

রাড়ুলি : পাইকগাছার রাড়ুলি'র অনার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের বাড়িটির প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। এটি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা গেলে দেশের জনগণের কাছে এই কীর্তিমান পুরুষের জীবনগাঁথা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং এটি দেশী-বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত হবে।

খুলনা জাদুঘর : "সর্বদলীয় খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় পরিষদ"-এর অব্যাহত দাবির মুখে খুলনা নগরীর শিববাড়ির মোড়ে জিয়া হলের পাশে বিভাগীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৮ সালের ১২ই অক্টোবর এই জাদুঘরটির উদ্বোধন করা হয়। এই জাদুঘরের অধিকাংশ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রধানত পাহাড়পুর ময়নামতি, খানজাহান আলীর সমাধিসৌধ, বগুড়ার মহাস্থানগড়, ঝিনাইদহের বারবাজার ও ভরত ভায়নার স্তূপ থেকে সংগ্রহ করা হয়। ভরত ভায়না থেকে যে সব পুরাকীর্তি সংগ্রহ করা হয় তারমধ্যে অন্যতম হল পোড়ামাটির মূর্তি বা তার অংশবিশেষ, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, অলংকার, লোহার পণ্যসামগ্রী, অলংকৃত ইট, পশুর দাঁত ও হাড় ইত্যাদি । এখানে ময়নামতি

থেকে সংগ্রহকৃত নবম/দশম শতাব্দীর পাথর নির্মিত দণ্ডিত ধ্যানী বৌদ্ধমূর্তি রয়েছে। দশম-একাদশ শতাব্দীর বিষ্ণুমূর্তিসহ পঞ্চম শতকের গুপ্ত যুগের কিছু মুদ্রাও রয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত লোকবলের অভাবে এটির নিয়মিত কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। অচিরেই একে পরিপূর্ণ কমপ্লেক্সের রূপ দেয়া হবে। এটি খুলনার পর্যটন শিল্প সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত করেছে।

পাইকগাছা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর : খুলনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে পাইকগাছার নাম উল্লেখযোগ্য। খুলনা সাবসেক্টরকে যে ১৯টি ক্যাম্পে বিভক্ত করা হয় তার একটি ছিল এই পাইকগাছায়। খুলনা সাব-সেক্টরের অন্যতম অধিনায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা স.ম. বাবর আলীর নেতৃত্বে পাইকগাছা সদর থানা আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে এখানে আল বদর বাহিনী নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এই পাইকগাছাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে "পাইকগাছা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর"। ১৯৮৭ সালের ৮ই ডিসেম্বর এটি উদ্বোধন করা হয়। দ্বিতল ভবনের জাদুঘরের এক পাশে স্বাধীনতা স্মৃতিসৌধ এবং ভবনের ভেতরে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন যতো। এই জাদুঘর যেন মুক্তিযুদ্ধেরই জীবন্ত ইতিহাস।

পুরনো ঘরবাড়ি : খুলনা জেলার সুপ্রাচীন নগরায়নের ইতিহাসের অন্যতম সাক্ষী হল শহরের পুরনো কিছু ঘরবাড়ি। উদাহরণস্বরূপ শহরের সাহেববাজারের কাছে রেলওয়ে স্টেশনের পূর্বদিকে চার্লির বাড়ির কথা বলা যায়, যেটি খুলনার সর্বপ্রথম পাকা বাড়ি হিসেবে স্বীকৃত। এটি বর্তমানে রেল কর্মচারীদের বিশ্রামাগার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নীলকর চোটেল সাহেব বা চার্লি বিদ্রোহী কৃষকদের এখানে ধরে এনে অত্যাচার চালাতেন। এ ছাড়াও জেলা প্রশাসকের ভবন, জেলা কোর্ট ভবন, লাল দালান, খুলনা ক্লাব ভবন, খুলনা বিএল কলেজের প্রশাসনিক ভবন, করোনেশন হল ইত্যাদি পুরাতন ঘরবাড়ির অন্যতম নিদর্শন। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাব, অযত্ন আর অবহেলায় কালের সাক্ষী এ সব দালান-কোঠার ভগ্নদশা সহজেই অনুমান করা যায়।

পীরের দরগা, খানকা শরীফ : খুলনা শহর প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে জানা যায়, কালের ধারায় এখানে বহু ধর্মভীরু লোকজন ও ধর্ম প্রচারকদের আগমন ঘটে। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও বাংলাদেশ থেকে ধার্মিক লোকেরা এ সব স্থান পরিদর্শনে আসেন। তাই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ধ্বংসাবশেষ রক্ষা করে জেলার পর্যটন আকর্ষণ বাড়ানো সম্ভব।

সেনহাটি : খুলনা শহর থেকে ৫ মাইল দূরে ভৈরব নদীর তীরের একটি প্রাচীন গ্রাম সেনহাটি। দোচালা কালীমন্দির ও দীঘির কারণে গ্রামটি বিখ্যাত। ১৭৯৭ সালে স্থানীয় জমিদার রাজা শ্রীকান্ত রায় মন্দিরটি নির্মাণ করেন। গ্রামের বিজয় চন্ডীতলা স্থানটি সেন বংশীয় রাজা বিজয় সেনের স্মৃতি বিজড়িত বলে জনশ্রুতি রয়েছে। "সদ্ভাব শতক"-এর প্রণেতা স্বভাব কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সেনহাটির অধিবাসী ছিলেন। পুরনো মন্দির ও দীঘি সংরক্ষণ করে গ্রামটিকে পর্যটন স্থানে পরিণত করা যায়।

আগ্রা-কপিলমুনি : খুলনা শহর থেকে ২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কপোতাক্ষ নদের তীরে পাশাপাশি দুটি প্রাচীন গ্রাম আগ্রা ও কপিলমুনি। এই দুটি গ্রামে প্রাচীন স্থাপত্যকলা ও সংস্কৃতির নিদর্শন রয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু স্তূপ, ইটের ভগ্নাবশেষ, দরবেশ জাফর আলী শাহের সমাধিক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য। তবে, অযত্ন আর অবহেলায় কপিলশ্বরী কালীমন্দিরটি আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।